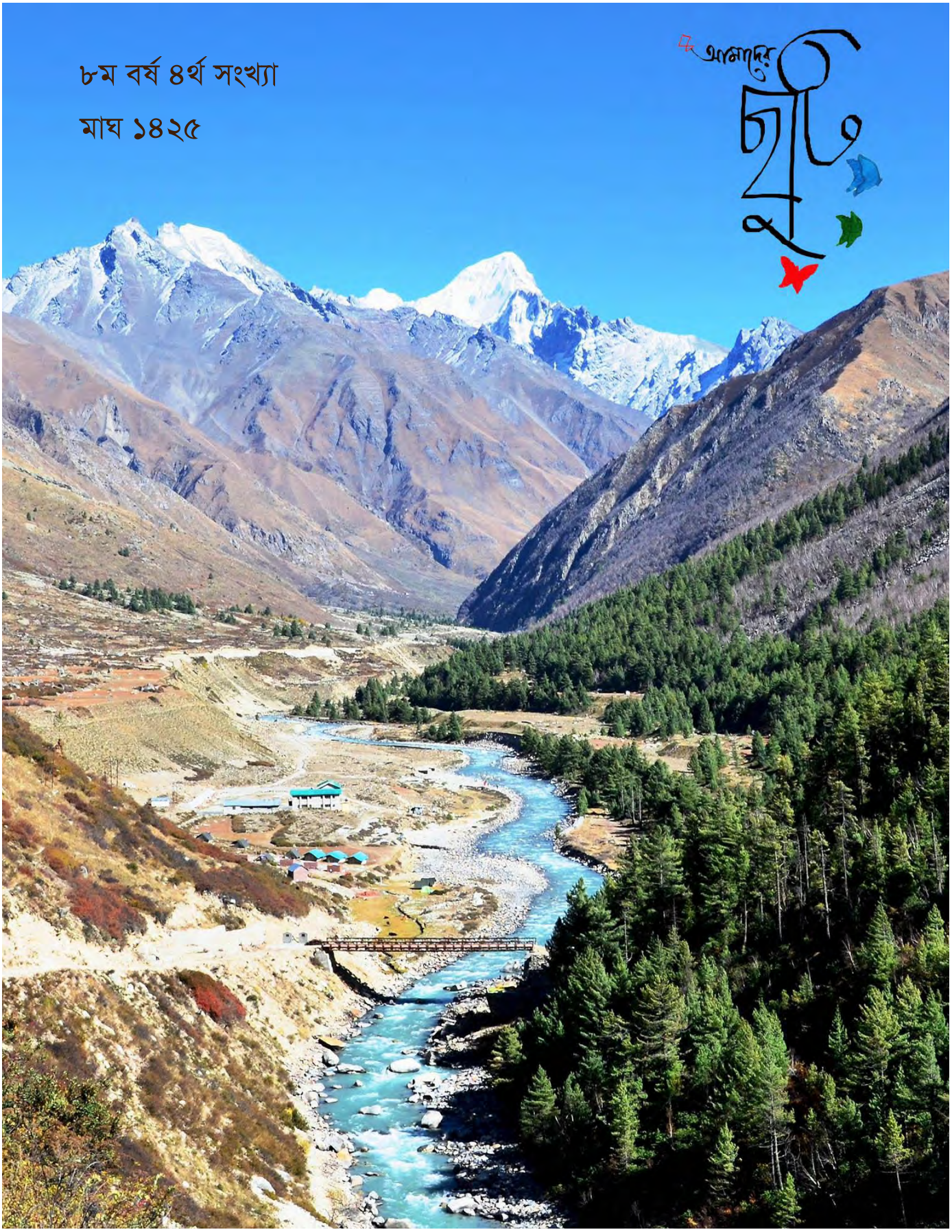

কিন্নরের নিসর্গ - আলোকচিত্রী শ্রী সুদীপ্ত ঘোষ

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

~ ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৫ ~

চেরীব্লসম ফেস্টিভালের তখনও বেশ কয়েকদিন বাকি - পথঘাট ছেয়ে গেছে হালকা গোলাপী রঙের চেরীফুলে। নভেম্বরের ঝকঝকে আবহাওয়া আর দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যে আমাদের মুগ্ধ করেছিল শিলং। মেঘও যে কত সুন্দর হতে পারে!

কেটি মিত্তিরদের ভিড়ে অবশ্য অমিত-লাবণ্যের দেখা পেলাম না। আর মনে হল একালে হলে তাদের দেখা হত গাড়ির ধাক্কায় নয়, শিলং-এর বিখ্যাত জ্যামে আটকে। কী আর করি মনের দুঃখে রবি ঠাকুরের বাড়িতে গেলাম। দেখি সেদিন সেও বন্ধ। শিলং-এর এই এক মুশকিল। রোজ সাইট সিয়িং-এর কোনও না কোনও জায়গা বন্ধ থাকে - একদিনে যে সব দেখে নেবে ওটি হচ্ছে না। তাই ক'দিন শিলং-চেরাপুঞ্জি ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েকটা ঝরনা দেখলাম, মিউজিয়াম দেখলাম, ডাওকি নদীর স্বচ্ছ জলে নৌকাবিহার হল ওপার বাংলার সীমানায়, চমৎকার দুটো গুহা দেখলাম, আর দেখলাম মেঘের পরে মেঘ। তাও বাকি রয়ে গেল জিপলাইন অ্যাডভেঞ্চার।

দুদিন ঘুরে, শেষমেষ তৃতীয় দিনে রবিঠাকুরের বাড়ি খোলা পাওয়া গেল। কিন্তু একটিমাত্র ঘরে ছাড়া পুরোনো জিনিসপত্র কিছুই নেই, একটু হতাশই হলাম। কালিম্পং, মংপু-র পরে শিলং-এ রবিঠাকুরের দেখা পেলাম কি? ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। মনের মধ্যে গুনগুন করছিল ঢুকেই ঘরের ডানহাতে দেওয়ালে টাঙানো 'শেষের কবিতা'-র লাইনগুলো - 'মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়...।' টুপটাপ কয়েকটা চেরীফুল ঝরে পড়ল গায়ে-মাথায়।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"তখন রাত সাড়ে চারটা। সমস্ত নগর নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত, পথ জনশূন্য, আমরা ল্যাম্প জ্বেলে রওনা হ'লাম। আমরা হাওড়া পুলে এসে দেখ্‌লাম পুল খোলা। কাজেই আমাদের এখানে প্রায় মিনিট পনের দাঁড়াতে হ'ল।"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত"

~ আরশিনগর ~

ইতিহাসের পাথরা - সায়ন ভট্টাচার্য

ইছামতীর তীরে - জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ

~ সব পেয়েছির দেশ ~

চলতে চলতে গোয়েচা লা - অভিষেক মারিক

ভূস্বর্গ কিন্নরে - সুদীপ্ত ঘোষ

রাজ কাহিনি (শেষ পর্ব) - তপন পাল

~ ভুবনডাঙা ~

ইয়েলোস্টোন পার্কে - কালীপদ মজুমদার

শ্রীলঙ্কায় দিনকয়েক – অরীন্দ্র দে

~ শেষ পাতা ~

বিনসরে এক বিকেল – অরিন্দম পাত্র

অজন্তা-ইলোরা ছুঁয়ে আসা – পলাশ পান্ডা

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 2019 **AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu**

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' -এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নন। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

আয়োজন
(কলিকাতা হইতে কুলটি)

১

তারিখটা ঠিক মনে নেই, জুলাই মাসের একটা সন্ধ্যায় কয়েক বন্ধু মিলে আমাদের ক্লাবে (Gay Wheelers Club) ব'সে এবার পূজায় কোথায় যাওয়া যাবে তারই আলোচনা হচ্ছিল। সেদিন বৃষ্টিটা যেমন এলোমেলো ভাবে পড়ছিল, সেইরকম আমাদের গন্তব্য সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনাটাও কোনো একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পার্‌ছিল না। অনেক আলোচনার পর পেশোয়ার যাওয়াই যখন কতকটা ঠিক হ'য়ে এল তখন আনন্দ বল্‌লে, "আকর্ষণবিহীন পেশোয়ার অপেক্ষা ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাওয়াই কি আনন্দদায়ক ও একটু বেশী adventurous ব'লে মনে হয় না?" কথাটা সকলেরই মনে লাগ্‌ল। কাশ্মীর পৃথিবীর মধ্যে একটি দেখ্‌বার মতো জায়গা। আর সাইকেলে যাওয়া দুঃসাহসিকতা ও নূতনত্বের বিষয় ব'লেই বোধ হয় আর কোন প্রতিবাদ উঠ্‌ল না। কাশ্মীর যাওয়া যখন স্থির হ'ল তখন কেউ কেউ এটা 'আগাগোড়া সাইকেল ভ্রমণ' হোক্ এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় অনেক তর্কের পর শেষে আমাদের প্রোগ্রাম দাঁড়াল - Calcutta to Srinagar and Back Via Nagpur অর্থাৎ 'কলিকাতা হইতে শ্রীনগর ও শ্রীনগর হইতে নাগপুর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।'

ম্যাপে দেখা গেল, এই ভ্রমণটি ৪০০০ মাইলের বরঞ্চ কিছু বেশীই হবে আর সময়ও নেহাৎ কম লাগ্‌বে না। সেইজন্য কেবল চার জনের অতিরিক্ত উৎসাহের জন্য আমাদেরই যাওয়া ঠিক হ'ল। প্রোগ্রামটা শেষ করা ও যাতে এই ভ্রমণটি বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেককে নিম্নলিখিত এক-একটি কাজের ভার দেওয়া হ'ল -

১। অশোক মুখোপাধ্যায় - General Manager, অর্থাৎ যাতে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তার জন্য দায়ী।
২। আনন্দ মুখোপাধ্যায় - Engineer, অর্থাৎ সাইকেল মেরামত ও সাইকেল সম্বন্ধীয় সব রকম কাজের জন্য দায়ী।
৩। নিরঞ্জ মজুমদার - Quarter Master, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ও ঐ সম্বন্ধীয় সব রকম কাজের জন্য দায়ী।
৪। মণীন্দ্র ঘোষ - Log keeper, অর্থাৎ দৈনিক সব রকম ঘটনা, রাস্তা ও দূরত্ব প্রভৃতির হিসাব রাখবার জন্য দায়ী।

২২শে সেপ্টেম্বর আমাদের যাওয়ার দিন ঠিক করা গেল। যাওয়ার কয়েক দিন আগে আমাদের সাইকেল চারখানা আগাগোড়া মেরামত করা হ'ল। সাইকেলে বেশী জিনিস নেওয়া অসম্ভব ব'লে আমরা নিতান্ত দরকারী জিনিস ভিন্ন আর কিছুই নিলাম না। তাতে আমাদের প্রত্যেকের সরঞ্জাম এই দাঁড়াল - ১টি কম্বল, ১টি লুঙ্গি, ১টি খাকি সার্ট, ১টি তোয়ালে, ১টি এনামেল কাপ। এছাড়া সাইকেলের 'টায়ার' ব্যতীত যাবতীয় সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি ও shaving set (ক্ষুর ইত্যাদি) সকলে ভাগ ক'রে নেওয়া হ'ল। এইসব সরঞ্জাম সমেত প্রত্যেক সাইকেলের ওজন দেখা গেল ৫৪ পাউন্ড।
আমাদের সাইকেল চারটির মধ্যে ১টি Imperial Triumph, ১টি Albion ও ২টি Standard । আমরা Dunlop, Moseley, Burgounan ও Richmond টায়ার ব্যবহার করেছিলাম। তখন বেজায় গরম ও সাইকেল নিয়ে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ব'লে জম্মুতে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। আমাদের যাওয়ার পোষাক হ'ল - খাকী সর্ট, সার্ট, কোট, হ্যাট, মোজা ও 'সু'।

যাত্রা কর্‌বার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা কলিকাতার মেয়র ও স্থানীয় একজন M.L.C. ও দু'একজন নামজাদা লোকের চিঠি (introductory letter) যোগাড় ক'রে নিলাম। বলা বাহুল্য, এগুলি পুলিশের অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতির (?) হাত থেকে কতকটা রক্ষা করে। শুন্‌লাম, পুলিশ কমিশনারের এইরূপ একখানি চিঠি সঙ্গে থাক্‌লে পুলিশের হাঙ্গাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জান্‌লাম যে তাঁরা 'খোজ খার' না ক'রে কাউকে কোন রকম চিঠিপত্র দেন না। খোঁজ নেওয়ার জন্য আমাদের ঠিকানা রেখে দিলেন - কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের 'সুপারিস-পত্র' পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এইজন্যই আমাদের যাওয়ার দিন পেছিয়ে দিতে হ'য়েছিল।

নানা প্রকারের বিদ্রূপ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যাওয়ার দিন ক্রমশঃ এগিয়ে এল। এখন এইখান থেকে আমাদের দৈনিক-লিপি আরম্ভ করা যাক্।

ভ্রমণকারীর দল
অশোক মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র ঘোষ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, নিরঙ্ক মজুমদার

কাশ্মীর-অভিমুখে

২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার - এই ঘটনাবহুল ভ্রমণের এক অধ্যায়ের আজ প্রথম দিন। আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিদায় দিতে সমবেত হ'লেন। বয়োজ্যেষ্ঠেরা যাত্রার সময় কল্যাণ কামনা করলেন - বন্ধুরা 'all success' ব'লে বিদায় দিলেন। তখন রাত সাড়ে চারটা। সমস্ত নগর নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত, পথ জনশূন্য, আমরা ল্যাম্প জ্বেলে রওনা হ'লাম। আমরা হাওড়া পুলে এসে দেখ্লাম পুল খোলা। কাজেই আমাদের এখানে প্রায় মিনিট পনের দাঁড়াতে হ'ল। পরে হাওড়া ষ্টেশনকে বাঁ দিকে ফেলে ক্রমশঃ আমরা গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোডে পড়লাম। তখনও বেশ অন্ধকার, কিন্তু রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়ায় আমাদের একটু অসুবিধা হ'তে লাগ্ল। ভোরবেলা লিলুয়ায় এসে ল্যাম্প নিভিয়ে দিলাম। রাস্তা খারাপ হ'তে আরম্ভ হ'ল। পাঁচ মাইল-ষ্টোনের কাছে দেখা গেল মিটার আল্গা হ'য়ে যাওয়ায় সরে গেছে -তাতে কিছু ওঠে নি। নেমে মিটার ঠিক ক'রে আমরা সাইকেলে উঠ্লাম।

সূর্যোদয় হ'য়েছে। বালিতে গঙ্গাকে ডান দিকে রেখে উত্তরপাড়া; কোন্নগরের ভিতর দিয়ে চলেছি। দু'পাশে মিলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে। গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের ভিড়ও কম নয়। কলকাতার আঁচ এখনও একেবারে যায় নি। মাঝে মাঝে রেলের লাইনের গেট বন্ধ থাকায় আমাদের নাম্তে হচ্ছিল। ক্রমশঃ রাস্তার পাশে গাছপালা সুরু হ'ল। সবুজ শাখা-পত্রসমাচ্ছন্ন বাগানের ভিতর দিয়ে বাড়ীগুলি পিছনে রেখে আমরা ব্যাণ্ডেলের কাছে এসে পড়্লাম। প্রখর রোদে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে চা খাওয়ার জন্য মাইল খানেক কাঁচা রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গেলাম।

রওনা হতে বেলা নটা হ'য়ে গেল। আবার গ্র্যাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চল্লাম। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু রোদের তেজে আমাদের বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল। মগরা ছাড়াতে প্রায় বারটা বাজ্ল। জল খাওয়ার জন্যে আমাদের প্রায়ই এখানে সেখানে নাম্তে হচ্ছিল। এবার অগ্রসর হওয়া কঠিন হ'য়ে উঠ্ল। রাস্তার ধারে একটা বড় আম গাছের ছায়ায় আমরা বিশ্রাম করতে নাম্লাম। আশেপাশের কুঁড়ে থেকে কয়েকটি চাষী সপরিবারে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এখনও মনে পড়ে তাদের দেওয়া জল আমরা কত তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলাম। মিনিট পনের বিশ্রামের পর আবার রওনা হ'লাম। এবার রাস্তা ক্রমশঃ বেশ ভাল হ'তে আরম্ভ হ'ল। বেলা একটার পর আমরা বৈঁচিতে মন্মথ কুমার মহাশয়ের গোলাবাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'লাম। এখানে আগেই খবর দেওয়া ছিল।

বেলা চারটার সময় চা খাওয়ার পর আমরা রওনা হ'লাম। সবুজ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঢাকা লাল রাস্তাটি এঁকে বেঁকে বর্দ্ধমানের দিকে চ'লে গেছে। সূর্য্যের তেজ কমে আসাতে আমাদের কষ্ট অনেক কমে গেল। এতক্ষণে সমস্ত দিনের শ্রান্তি লাঘব হ'ল। বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ-শ্যামল ছবিখানি আমাদের মনের মধ্যে একটি রঙীন রেখা টেনে দিলে। বন্ধু অশোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গান গেয়ে উঠল।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ উচ্ছ্বাস রইল না। কিছু আগেকার ছোট্ট মেঘখানি একটু একটু ক'রে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। চারদিক অন্ধকার; ঝড় সুরু হ'ল। বৃষ্টি আসন্ন দেখে গান থামিয়ে আমরা জোরে যেতে লাগ্লাম। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টুপির পাশ দিয়ে মুখে পড়তে লাগ্ল। আকাশের এই রকম অবস্থার জন্য বর্দ্ধমান পৌঁছানর আশা ত্যাগ ক'রে দূরে ষ্টেশন দেখে সেখানে আশ্রয় নিতে উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম শক্তিগড় ষ্টেশন। আমাদের সেখানে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। রাত কাটাবার জন্য দু'খানা বেঞ্চ দখল ক'রে কম্বল পেতে বিছানা পেতে ফেল্লাম। চার পাশে সাইকেলের উপর আমাদের ভিজা পোষাক রাখা হ'ল। রাত ন'টার পর বৃষ্টি থাম্লে নিরঙ্ককে খাওয়ার যোগাড়ের জন্য পাঠান হ'ল, বেশী রাত হওয়ায় দোকান বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিছু পাওয়া গেল না। হ্যাভারস্যাক থেকে নাসপাতি নিয়ে, আর চিনির সরবত তৈরী ক'রে সে-দিনের মতো খাওয়া শেষ ক'রে ফেল্লাম।

ডায়েরী লেখার পর মশা ও ছারপোকার অনুগ্রহে বৃথা ঘুমের চেষ্টা ক'রে বাইরে খোলা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম। ছিন্ন মেঘের ফাঁক থেকে পঞ্চমীর চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না গাছের ভেজা পাতার উপর প'ড়ে পল্লীমায়ের আর এক শ্রী দেখালে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। কোটটাকে গায়ে টেনে দিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারি ক'রে আমরা কোনোরকমে রাত কাটিয়ে দিলাম। আজ মোট ৬৫ মাইল আসা হ'ল।

২

২৩ শে সেপ্টেম্বর বুধবার - তখন আলো-আঁধারের মিলন-মুহূর্ত্ত। সদ্যোজাত শিশু-অরুণের রক্তিম আভা পৃথিবীর কোলে এসে পৌঁছয় নি। আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লাল রাস্তার দু'পাশের শিশিরে ভেজা সবুজ ঘাসের রেখা যেন রাস্তাটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের সঙ্গে চল্তে সুরু করল। কালকের রাতের শ্রান্তি আজ ভোরের হাওয়ায় যেন কোথায় চ'লে গেল। ক্রমশঃ আশে পাশের, গাছে-ঢাকা বিহঙ্গ-নীড়ের মতো স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ গ্রামগুলি ফেলে রেখে আমরা বর্দ্ধমানের কাছে এসে পড়লাম। এখানে সেখানে বাগানের দেয়ালে কোথাও বা গাছের গায়ে 'ডিঃ গুপ্ত', 'গেলের পাঁচন' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখা যেতে লাগ্ল। ধূমপানরত বৃদ্ধেরা একবার আমাদের দিকে আগ্রহশূন্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আবার নিজ-নিজ কাজে গভীর মনঃসংযোগ করতে লাগলেন। একটা ছোট পুল পার হ'য়ে আমরা কার্জ্জন গেটের মধ্যে দিয়ে বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ করলাম। এক বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে তাকে যথেষ্ট বিস্মিত ক'রে তুলেছিলাম। এত ভোরে এরূপ অভিনব বেশে হঠাৎ আমাদের আবির্ভাবের কারণের উত্তরে শুধু 'Surprise' ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নাই বুঝিয়ে একখানা বেঞ্চে বসে পড়লাম, ক্ষিদেটা তখন বেশ রীতিমতভাবেই অস্থির ক'রে তুলেছে। এখানে চা ও মোটা গোছের জল-যোগের পর, গত রাত্রের জাগরণের অবসাদহেতু আজ আর অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হ'ল, তখন পকেট থেকে একটা টাকা বের ক'রে তার সাহায্যে ভাগ্য-পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল। আজ এখানে থাকার দলেরই জিৎ হ'য়েছে। সুতরাং কাছেই নিরঙ্কর মামা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী থাকায় সেখানে গিয়ে ওঠা গেল।

গুরুতর আহার ও রীতিমত বিশ্রামের পর সাইকেল পরিষ্কার ক'রে সন্ধ্যার আগে সহর দেখতে বার হ'লাম। সহর দেখে আমরা ষ্টেশনের দিকে চল্লাম। এখানে নূতন electric installation সুরু হ'য়েছে দেখা গেল। ষ্টেশনে নিরঙ্ক চিঠি লিখে আসানসোলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত ক'রে তার নিজের

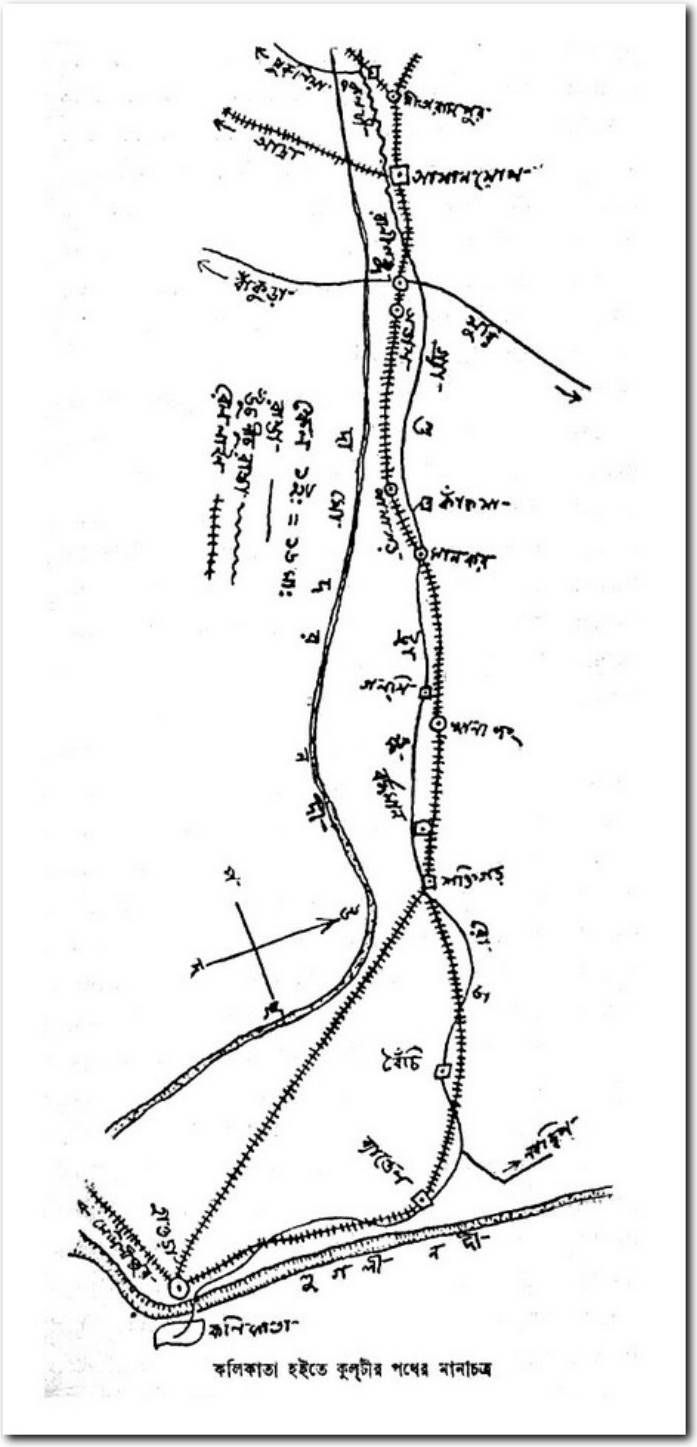

কলিকাতা হইতে কুলটীর পথের মানচিত্র

কর্ত্তব্য শেষ কর্‌লে। সকলের কৌতূহল-দৃষ্টি এড়িয়ে ও উপর্য্যুপরি প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর দিয়ে বাড়ী ফির্‌তে রাত ন'টা হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গত রাত্রের রাত্রিজাগরণের অবসাদটুকু পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। আজ ৮ মাইল এলাম। কলকাতা থেকে মোট ৭৩ মাইল আসা হ'ল।

২৪ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার - রওনা হতে ৫টা বাজল। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে আসানসোলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'লাম। ফর্সা হ'য়ে এল; রাস্তাটির বাঁদিকে ধান ক্ষেতের ওপারে দূরে কতগুলি সাদা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। খানিক দূর যাওয়ার পর অশোকের সাইকেলের ফ্রি হুইল একটু গোলমাল সুরু কর্‌লে। বাহনের ডাক্তার আনন্দর তখন ডাক পড়্‌ল। মিনিট দশেক কস্‌রতের পর সেটাকে ঠিক ক'রে আবার চল্‌লাম। চন্‌চনে রোদে তেষ্টা পেতে গলসি থানায় নেমে জল খেলাম। থানায় দু'একটী কনেষ্টবল ছাড়া আর কেউ নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল ইন্‌স্পেক্টার-বাবুরা সদলবলে বেলজিয়ামের রাজদম্পতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লাইনের ধারে সারবন্দী হ'য়ে পাহারা দিতে গেছেন। পর পর বারখানি ওভারল্যান্ড মোটর ধূলো উড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ধূলোয় সমস্ত শরীর ভ'রে গেল - এটা ভারী বিরক্তিকর। কে জান্‌ত তখন এই অসুবিধাটুকু অল্পবিস্তর রোজই ভোগ কর্‌তে হবে।

রাস্তার রং গেরিমাটির মতো লাল হ'তে সুরু হ'য়েছে। রেলের লাইনটি ক্রমশঃ স'রে আস্‌তে আস্‌তে একবারে রাস্তা ডিঙিয়ে পাশে পাশে চল্‌ল। বাঁ দিকে পানাগড় ষ্টেশন। দূরে ডান দিকে কাঁসর ঘন্টার বাজনা শুনে আজ যে সপ্তমী পূজা, মনে পড়ে গেল। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা। পূজাবাড়ীতে এ বেলার মতো আতিথ্য গ্রহণ করা সকলের ইচ্ছা হওয়াতে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা ধ'রে প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পর কাঁকসা গ্রামের মধ্যে পূজাবাড়ীতে পৌঁছলাম। এ রকম নূতন ধরণের অতিথিদের অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য বাড়ীর কর্ত্তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এত কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাদের দেশ ভ্রমণে যাওয়ার অর্থ, যখন তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও বোঝাতে না পেরে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছি, বাড়ীর ছেলেরা তখন বেরিয়ে এসে আমাদের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার কর্‌লেন। তাঁরা আমাদের পোষাক ও সাইকেলের সরঞ্জাম দেখেই সমস্ত বুঝতে পেরেছিলেন ও বাইরের একখানা ঘরে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমরা পোষাক ছেড়ে লুঙ্গি প'রে চান কর্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগলাম। কর্ত্তারা একেই আমাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন তার ওপর যখন লুঙ্গি প'রে আমরা পুকুরে চান কর্‌তে গেলাম, তখন বৃদ্ধ পুরুত মশায়ের সঘন দৃষ্টিপাত জানিয়ে দিল যে আমাদের এরূপ ম্লেচ্ছ-আচরণ তিনি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ছেন না। কিন্তু আমরা তাতে নাচার। পরে সে দিন রাস্তায় আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তখন বলাবলি করেছিলাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফল না কি!

বেলা তিনটার পর রোদের ঝাঁঝ কম্‌লে আমরা বেরুলাম। বাঁ দিকে দূরে অস্পষ্ট পাহাড় দেখা গেল। অবেলায় খাওয়ার জন্য বড় আলস্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল। মন্থর গতিতে চলেছি, সাম্‌নে থেকে একটা গরুর গাড়ী এসে আমাদের পাশে উপস্থিত হ'ল। গরু দু'টির রকম দেখে বোঝা গেল তারা আমাদের মানুষ ছাড়া, অন্য কোন জীব ঠাউরেছে। তিন জন পর-পর পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়ার পর গরু দুটি ভয় পেয়ে হঠাৎ একেবারে ঘুরে মাঠে নেমে পড়্‌ল, আর সেই সঙ্গে আনন্দর সাইকেলের সাম্‌নের চাকা গরুর গাড়ীর পিছনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এমন বেঁকে গেল যে সাইকেল একেবারে অচল হ'য়ে পড়্‌ল। তখন বেলা পাঁচটা - আসানসোল আটাশ মাইল দূরে - এরূপ দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সাইকেলের রিমের এরকম অবস্থা দেখে ভারী মুস্কিলে পড়্‌লাম। কারণ এ-কে মেরামত কর্‌তে যে সরঞ্জামের দরকার তা সাইকেলে ব'য়ে আনা সম্ভবপর নয়, কাজেই আমাদের সঙ্গে তা ছিল না। যাই হোক কোন উপায় না দেখে আমরা বিনা সরঞ্জামে যতদূর সম্ভব মেরামতের চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হ'য়ে যখন ট্রেণে সাইকেলখানিকে পাঠাবার জন্য ষ্টেশনের খোঁজে কাছের এক গ্রামে যাওয়ার আয়োজন কর্‌ছি, তখন হঠাৎ বর্দ্ধমানের দিক থেকে একখানা মোটর লরী আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলাম। কাছে এলে তাকে ইসারা ক'রে থামান গেল। গাড়িখানি নূতন। কলকাতা থেকে কিনে মোটর সার্ভিসের জন্য বরাবর পাঞ্জাবে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজের অবস্থা বুঝিয়ে তাদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে, সাইকেল শুদ্ধ আনন্দকে ঐ লরীতে আসানসোলে পাঠানর ব্যবস্থা করা গেল।

যখন তিন জনে সব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে সাইকেলে উঠ্‌লাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাইল দুই আসার পর যখন দুর্গাপুরের জঙ্গলে ঢুক্‌লাম তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আলো জ্বাল্‌তে হ'ল। রাস্তাটি হঠাৎ ঢালু হ'য়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে। দু'পাশে বড় বড় গাছ দৈত্যের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল সাইকেলের সোঁ সোঁ শব্দ যেন এই নিস্তব্ধতায় আরও বেড়ে উঠ্‌ল। অন্যমনস্ক হ'য়ে ঢালু রাস্তায় পর পর তিন জন চলেছি, কতক্ষণ তা মনে নেই। চমক ভাঙ্‌ল যখন দেখি আমরা পরস্পরের ঘাড়ের উপর। ধূলো ঝেড়ে উঠে দেখি সাইকেল তিনখানি তিন জায়গায় প'ড়ে ঘুর্‌ছে। হঠাৎ এ বিপত্তির কারণ আর কিছু নয়, রাস্তা মেরামত হওয়ার দরুণ বড় বড় গাছের গুঁড়ি ও ডাল-পালা-ফেলা বন্ধ রাস্তার ওপরে সাইকেল ক'রে যাবার আমাদের

অন্যায় চেষ্টা! পরে আরও অনেক জায়গায় দেখেছিলাম P.W.D, No Throughfare এর নোটিশ এমনি ক'রেই দেয়।

জঙ্গল পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা খারাপ ও উঁচু নীচু হতে সুরু হ'ল। দু'পাশে অন্ধকার ঢাকা মাঠে এখানে সেখানে কয়লা-স্তূপের আগুনের অস্পষ্ট আলোয় কুলীরা জটলা কর্‌ছে। থেকে থেকে তাদের মাদলের বাজনা শোনা যাচ্ছে। বুঝতে পার্‌লাম আমরা কয়লা খনির দেশে এসে পড়েছি। ক্রমশঃ চাঁদের ক্ষীণ আলো দেখা দিল। অণ্ডাল ছাড়িয়ে রাণীগঞ্জে চা খেয়ে নেওয়া যাবে মনে কর্‌লাম্ কিন্তু রাস্তা থেকে ষ্টেশন পাঁচ ছ' মাইল দূর শুনে একেবারে আসানসোলের দিকে পাড়ি দিলাম। আসানসোলের কয়েক মাইল দূর থেকে Colliery (কোলিয়ারির) সাহেবদের মোটরের চোখ-ঝল্‌সান আলো আমাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লে। অশোকের সাইকেলের ফ্রি হুইল আবার গোলমাল সুরু কর্‌লে। বোঝা গেল আসানসোলে রীতিমত সংস্কার না কর্‌লে এর দ্বারা আর কাজ চল্‌বে না। কাঁকসা থেকে বেরিয়ে অবধি একটা না হাঙ্গাম লেগেই রয়েচে। মিউনিসিপ্যালিটি ও ষ্টেশনের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আমরা পিচ দেওয়া রাস্তা দিয়ে সহরের মধ্যে এসে পড়লাম। তখন রাত দশটা। রাস্তার ওপরে এক সাইকেলের দোকানে আনন্দকে দেখে আমরা নেমে পড়্‌লাম। সাইকেল মেরামত আরম্ভ হ'য়ে গেছে দেখে বর্দ্ধমানের বন্দোবস্ত-অনুযায়ী নিরঙ্কর আত্মীয় শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসুর বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। সমস্ত দিন হায়রানের পর কয়েক পেয়ালা চা অমৃতের মতো মনে হ'ল।

আজ ৬৬ মাইল আসা গেছে। কলকাতা থেকে মোট ১৩৯ মাইল আসা হ'ল।

২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার - সকালে উঠে চা খেতে ন'টা বাজ্‌ল। মিস্ত্রীকে তাড়া দেবার জন্য সকলে তার দোকানে উপস্থিত হ'লাম। এসে শুন্‌লাম সামনের ফর্কটি (Fork) আর না বদল কর্‌লে চল্‌বে না। কাল রাত্রে দেখ্‌তে পাই নি, আজ দেখে বুঝতে পার্‌লাম মিস্ত্রীর কথাই ঠিক। গাড়ীটির Fork (ফর্ক) ও একখানা mud guard (মাড্ গার্ড) বদল আর Rim (রিম্) মেরামত করা হ'ল। বলা বাহুল্য এখানে এ সবের দাম ক'লকাতার দ্বিগুণ।

এইসব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে ফির্‌তে প্রায় বারটা বাজ্‌ল। খাওয়া-দাওয়ার পর বেরুতে বেলা সাড়ে তিনটা হ'ল। সহরের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। বাঁদিকে সারি সারি দোকান ও ডান দিকে বরাবর রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কোয়ার্টার ছাড়িয়ে আমরা বি, এন, আর পুলের ওপর উঠ্‌লাম; নীচে দিয়ে লাইনটি আদ্রার দিকে চ'লে গেছে। বাংলার দৃশ্য এখানে একেবারে বদ্‌লে গেল। দূরে ছোট পাহাড় আর তাদের পায়ের নীচে ধানে-ভরা সবুজ ক্ষেত। ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের ওপর দিয়ে লাইনটি ক্রমশঃ অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। রাস্তাটিও সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউয়ের মতো একবার উঁচু একবার নীচু হ'য়ে চল্‌ল। এরকম রাস্তায় সাইকেল চালান ভারী কষ্টকর। ওপরে ওঠবার সময় সাইকেল সবচেয়ে উঁচু জায়গাটীর কাছ পর্য্যন্ত এসে একেবারে থেমে পড়ে। নাম্‌বার সময় অবশ্য খুব আরাম কিন্তু লাভ লোকসান খতিয়ে দেখলে লোকসানের ভাগই বেশী। সীতারামপুরের কাছে নিয়ামতপুরে এসে জল খাওয়ার জন্য নাম্‌তে হ'ল। একে এ রকম রাস্তা তার ওপর রোদের ঠেলায় প্রাণ অস্থির। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশে মেঘ জম্‌তে সুরু কর্‌ল। কুলটির কাছে যখন এলাম মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে - ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। বড় সুবিধা বোধ হ'ল না। আমাদের বরাকর পৌছানর কথা ছিল। সে প্রোগ্রাম বদ্‌লে কুল্‌টীতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। রাস্তার উপরে ডানদিকে কুলটী কারখানার (Kulti Iron Works) সাহেবদের লাইন বন্দি বাঙ্গলো। এখানকার মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার রায়ের নাম আমরা আগেই শুনেছিলাম। ইনি খেলা-ধূলার বিশেষ উৎসাহী ও টুরিষ্টদের উপর এঁর বিশেষ সহানুভূতি আছে। এঁর বাঙ্গলো খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। আমাদের দেখে খুব খুসী হলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল।

আজ মহাষ্টমী। এখানকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। সহরটি খুব ছোট জায়গা - কারখানাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে সহরটি গ'ড়ে উঠেছে। সহরের দৃশ্য বেশ মনোরম। রাস্তায় বিজলীবাতি ও জলের কলেরও অভাব নাই। শ্রান্ত হ'য়ে সহরের বাইরে খোলা মাঠে এসে বস্‌লাম। পাতলা কুয়াসার জাল ছিঁড়ে চাঁদের আলো সহরটিকে ঘিরে ফেলেছে।

আজ ৯ মাইল এগিয়েছি, কল্‌কাতা থেকে ১৪৮ মাইল আসা হ'ল।

- ক্রমশঃ -

(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

ইতিহাসের পাথরা

সায়ন ভট্টাচার্য

ইতিহাস বিষয়টি কোনও দিন আমার প্রিয় ছিল না। ছোটবেলা থেকেই বিষয়টির প্রতি অবহেলা করে এসেছি, অথচ সেই ইতিহাস ও এক ইতিহাসবিদের আকর্ষণে চেপে বসেছি ট্রেনে। হাওড়া থেকে আপ মেদিনীপুর লোকাল। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর মেদিনীপুর। স্টেশনচত্বরেই ক্ষণিক ঘোরাঘুরি করে আলাপ করে ফেললাম রাজাদার সঙ্গে। রাজাদার মারুতি গাড়িতেই রওনা দিলাম মন্দিরময় পাথরার উদ্দেশ্যে। মন্দিরময় পাথরা বলা হয়, কারণ এই গ্রামে আছে প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো নানান টেরাকোটাসমৃদ্ধ মন্দির। স্টেশন থেকে দূরত্ব মাত্র বারো কিমি। অটোও মেলে, আমতলা - পাথরা। আধ ঘন্টার রাস্তা।

গাড়ি ছাড়তেই ইয়াসিন সাহেবের ফোনটা এল। আমাদের যাওয়ার কথা আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন -
'কত দূরে?'
'গাড়িতে উঠে পড়েছি দাদা' উত্তর দিলাম।
ইয়াসিন সাহেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ইনিই সেই ইতিহাসবিদ যাঁর টানে পাথরা আসা। শুধু ইতিহাসবিদ-গবেষক-লেখক নন, তিনি আস্ত এক ভারতবর্ষ যেখানে বাজে সম্প্রীতির সুর। নিজের জীবন বিপন্ন করে, সমস্ত চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে যিনি রক্ষা করেন পরধর্মের সম্পদ। পাথরার ইতিহাস ও পুরাকীর্তি আজও স্বমহিমায় বর্তমান শুধু এই মানুষটির জন্যেই।

আমাদের গাড়ি এসে থামল একটি মাঠে। গাড়ি থেকে নামতেই মন প্রসন্ন হয়ে গেল। বড় রাস্তাটা যেখানে গিয়ে মিশেছে ততদূর অবধি কোন বসতবাড়ি চোখে পড়ল না। রাস্তার এক পাশে সবুজ ঘাসের গালিচাঢাকা প্রান্তর। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু মন্দির। আবার রাস্তার অপর দিকেও রয়েছে মন্দিররাজি। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জমি ধাপে ধাপে নিচু হয়ে মিশে গেছে ধানজমিতে। ধানজমি মিশেছে নদীতে। আমাদের দেখে

এগিয়ে এলেন প্রভাত ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইনিই পাথরার মন্দিরগুলি ঘুরিয়ে দেখাবেন। প্রাথমিক আলাপচারিতার পর জানতে চাইলাম, ইয়াসিন সাহেব কোথায়? প্রভাতবাবু বললেন – 'উনি এই গ্রামেই আছেন। মন্দিরগুলি দেখা হয়ে গেলে সাক্ষাৎ হবে।' অর্থাৎ আরও বেশ কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে সেই মানুষটিকে দেখার জন্য।

শুরু করলাম নবরত্ন মন্দির থেকে। পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু মন্দিরে অমূল্য টেরাকোটার কাজ। মন্দিরের চাতালে বসেই প্রভাতবাবু মেলে ধরলেন ইয়াসিন সাহেবের হাতে তৈরি পাথরার এক অতিকায় মানচিত্র, সেই মানচিত্রে নিপুণভাবে বোঝানো হয়েছে পাথরার মন্দিরগুলির অবস্থান ও পথ-নির্দেশ। চৌত্রিশটির মত মন্দির রয়েছে পাথরায়। বিদ্যানন্দ ঘোষাল হাতির পা থেকে উতরে যাওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে মন্দির নির্মাণের কাজ করে চলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররাও বহু মন্দির তৈরি করেছেন। নবরত্ন মন্দিরের চারপাশ জুড়ে রয়েছে শিব মন্দির, তুলসী মঞ্চ। একটি শিব মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেলাম, মন্দির নির্মাণকালে ব্যবহৃত অর্থাৎ দু-আড়াইশো বছর আগের রঙ এখনও বিদ্যমান।

নবরত্ন ও তার সংলগ্ন শিবমন্দিরগুলির ঠিক অপর দিকেই রয়েছে কালাচাঁদ মন্দির। লাগোয়া শিব মন্দির রয়েছে তিনটি। ফলক দেখে জানা গেল ১৭৪৯ সালে নির্মিত। পাশেই সমসাময়িক সময়ে তৈরি মাকরা পাথরের দুর্গামন্ডপ। একে একে দেখে নিলাম শীতলা মন্দির, সর্বমঙ্গলা মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, ধর্ম মন্দির, সুড়ঙ্গ বাড়ি, কাছাড়ি বাড়ি, রাসমঞ্চ ইত্যাদি। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনগুলির পোড়ামাটির কারুকাজ বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেটুকু রয়েছে তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় ব্যাধের পাখি শিকার, দশাবতার, রাম-হনুমান, রাম-সীতা,রাধা-কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ-যশোদা, কালী-দুর্গা, ষড়ভূজ চৈতন্য, কৃষ্ণ-বলরাম, নগরপাল, দ্বাররক্ষী, বিভিন্ন দাস-দাসী ইত্যাদি। প্রসঙ্গত বলে রাখি পাথরা ও তার মন্দিরগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ইয়াসিন সাহেবের গবেষণামূলক গ্রন্থ - 'মন্দিরময় পাথরার ইতিবৃত্ত'।

ঘন্টা তিনেকে মন্দিরদর্শন সাঙ্গ করা গেল। এবার পালা ইয়াসিন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের। আমাদের গাড়ি যেখানে থেমেছিল, ফিরে এলাম সেখানেই। একটি শিব-মন্দিরের চাতালে বসে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। অতি সাধারণ আটপৌরে মানুষ। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালে সন্ধান মেলে তাঁর শক্তির, তাঁর গভীরতার। আমাদের দেখেই মুখভর্তি হাসি, ক্ষণিকেই আপন করে নিলেন। শুরু হল গল্প। আজ পাথরাকে যেমন দেখছি, তেমনটি আগে ছিল না। কালের নিয়মে তলিয়ে যেতে বসা মন্দিরগুলির প্রতি গ্রামের মানুষরাই ছিলেন উদাসীন। কেউ কেউ মন্দির থেকে ইট খুলে নিজের বাড়ি মেরামত করিয়েছিলেন। আবার মাকড়া পাথর চুরি হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে পর্যন্ত। ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের গবেষক তারাপদ সাঁতরার উৎসাহে পাথরার পুরাতত্ত্ব সম্পদ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন ইয়াসিন পাঠান। মুসলমান হয়ে হিন্দুদের মন্দির রক্ষা? মৌলবাদী শক্তিরা মেনে নেয় নি। তা সত্ত্বেও থামানো যায় নি ইয়াসিন সাহেবকে। নিজের সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশ করে শুরু হয় প্রচার। চলে মানুষকে সচেতন করার কাজ। পরবর্তী কালে ১৯৯১ সালে সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত করে গঠন করেন পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি। শুরু হয় সরকারি স্তরে পাথরাকে তুলে ধরার চেষ্টা। এই দীর্ঘ লড়াই এর ফলে ২০০৩ সালে ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ অধিগ্রহণ করে পাথরার চৌত্রিশটি মন্দির। ইতিমধ্যে আঠাশটি মন্দির সংস্কারও করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফেও পাথরাকে ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেল। জমিজট কাটলেই খুব শীঘ্র ভ্রমণ মানচিত্রে উঠে আসবে পাথরার নাম। ইয়াসিন সাহেবের শরীরটা ইদানিং ভালো নেই। হার্ট ও কিডনির রোগে আক্রান্ত। বেশি কথা বলাও বারণ। তবুও তিনি আমাদের এতটা সময় দিলেন। নিজেদের দরিদ্র মনে হচ্ছিল। ফিরতে হবে। আমি প্রণাম করার জন্য ওঁর পা স্পর্শ করতে যেই নীচু হয়েছি অমনি সলজ্জে আমায় বুকে টেনে নিলেন। আমিও আঁকড়ে ধরলাম। বললাম 'ভালো থাকবেন দাদা।' উনি বললেন "এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। এখনও অনেক কাজ বাকি।" আমার চোখে ততক্ষণে কংসাবতী নেমেছে। বিদায় জানিয়ে এক দৌড়ে চলে গেলাম নদীর পাড়ে। বেলা শেষের সূর্যের আলোয় নদীর জল ঝিক্‌মিক্ করছে।

বেসরকারি রপ্তানিকারক সংস্থায় হিসাবরক্ষক সায়ন ভট্টাচার্যের পেশাদারি জীবনের বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে প্রকৃতিপ্রেম ও সাংস্কৃতিকচর্চা। ছোট থেকেই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে 'উত্তর-হাওড়া শিল্পীলোক' দলের সঙ্গে নাট্যাভিনয় ও পরিচালনার কাজে যুক্ত। গতানুগতিক ভ্রমণ নয়, খোঁজ চলে অনাঘ্রাত পশ্চিমবঙ্গে কিম্বা বাইরে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইছামতীর তীরে

জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।"

কলকাতার ভিড়ে প্রাণবায়ু যেন হাসঁফাস করছিল। কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম একদিনের ছুটিতে কোথাও একটু ঘুরে আসব। দীঘা কিংবা বকখালি আর ভালো লাগে না। ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের চাপে এরা যেন এদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক করলাম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম বেড়ি পাঁচপোতা ঘুরতে যাব। শিয়ালদহ-বনঁগা লাইনের গোবরডাঙা স্টেশন থেকে মাত্র ১১ কিমি দূরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সবুজেঘেরা সুন্দর একটি গ্রাম হল বেড়ি পাঁচপোতা। গ্রামটির বুকের উপর দিয়ে তিরতির করছে ছোট্ট একটি অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, স্থানীয় ভাষায় যাকে বাওর বলা হয়। অনেকদিন আগে এটি ইছামতী নদীর অংশ ছিল। তারপর ইছামতী নদী আস্তে আস্তে দিক পরিবর্তন করে একটু দূরে চলে যাওয়ায় এটি মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদে পরিণত হয়েছে। পাঁচপোতার বুকে সুন্দর এই হ্রদ ছাড়াও আশেপাশে আরো কয়েকটি হ্রদ বা বাওর আছে। যেমন ডুমোর বাওর, ঝাউডাঙার বাওর, বলদেঘাটার বাওর ইত্যাদি। এরা যেন সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে বসে আছে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে। রূপের ছটায় কেউ কারো কাছে হারতে নারাজ। এ বলে আমি সেরা ও বলে আমি। পর্যটকদের কোন চাপ না থাকায় প্রকৃতিপ্রেমিকদের সেরা গন্তব্য বেড়ি পাঁচপোতা।

একটু সকাল সকাল শিয়ালদা থেকে চেপে বসলাম বনগাঁ লোকালে। ঘন্টা দুয়েকের থেকে একটু কম সময়ের মধ্যে পৌছে গেলাম গোবরডাঙা। সেখান থেকে অটো, বাস বা ট্রেকারে আধ ঘন্টার পথ বেড়ি পাঁচপোতা। এখানে শনি মঙ্গলবার বিরাট হাট বসে। দিনটি শনিবার হওয়াতে প্রথমেই পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখে নিলাম সুবিশাল গ্রাম্য হাটটিকে। প্রায় এক বর্গকিমি এলাকা নিয়ে সীমান্ত এলাকার সব থেকে বড় হাট এটি। দশ থেকে বারোটি গ্রামের প্রয়োজন মেটায় এই হাট। সব্জি থেকে দা-কুড়ুল কিংবা জামা-কাপড় সবই মেলে এখানকার হাটে। এখানকার সব্জি ট্রাকে করে পাড়ি দেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। চাষীদের সদ্য তুলে আনা সব্জি বিক্রি হচ্ছে এই হাটে।

বাজারের কাছেই অনুকুল ঠাকুরের মন্দির। প্রায় একবিঘা জমির ওপর অবস্থিত মন্দিরটি। পেছনেই বিশাল আমবাগান। মন্দিরদর্শনের পর বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম বাওরের দিকে। বাওরে পৌঁছে নৌকা ভাড়া করে মুড়ি আর পাঁচপোতার বিখ্যাত তেলেভাজা নিয়ে ভেসে পড়লাম জলে। মাথার ওপর নীল আকাশ আর সামনে নিশ্চল জলরাশি, এ যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি। দেড়-দুঘন্টা যে কী ভাবে কেটে গেল তা বুঝতে পারলাম না। তবে এর থেকে আর বেশি সময় নেওয়া গেল না, এরপর আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরতে হবে।

নৌকা থেকে নেমে বাজারে চলে এলাম। বাজারের কাছেই টোটো স্ট্যান্ড। এখান থেকে টোটো নিয়ে চললাম কালাঞ্চী বর্ডার দেখতে। বর্ডারে খাওয়ার কোনও হোটেল নেই। তাই হয় পাঁচপোতা বাজার থেকে খেয়ে যেতে হবে নতুবা বর্ডারে গিয়ে আপনাকে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্য যাওয়ার আগে দুপুরে রান্না করে খাওয়ার জন্য আমরা পাঁচপোতা বাজার থেকে টাটকা আনাজপাতি ও রান্নার অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে টোটোয় তুলে নিলাম। রান্নার জন্য গ্যাস আর প্রয়োজনীয় বাসনপত্র স্থানীয় ডেকরেটর্সের দোকান থেকে ভাড়ায় পেয়ে গেলাম। চাইলে হাটের থেকে দেশি মুরগি কিনে মাংসের দোকান থেকে কাটিয়ে নেওয়া যায়। তবে দেশি মুরগি পেতে গেলে একটু সকাল সকাল আসতে হবে। এছাড়া বাওড়ের সদ্য ধরা টাটকা মাছও বাজারে পাওয়া যায়।

পাঁচপোতা বাজার ছাড়ালে দু-ধারের দৃশ্য আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে লাগল। দুপাশে ফাঁকা মাঠ আর মাঝখান দিয়ে পিচঢালা কালো রাস্তা। কিছুদূর যাওয়ার পর পুরন্দরপুর থেকে বাম দিকে পরপর দুটি রাস্তা বর্ডারে চলে গিয়েছে, একটি তেঁতুলবেড়িয়া বর্ডারের দিকে এবং অপরটি কালাঞ্চী বর্ডারে। প্রথমে গেলাম কালাঞ্চী বর্ডার দেখতে। বর্ডারের রাস্তায় ঢুকে, কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল, কাঁধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে বি এস এফ টহল দিচ্ছে। পরিচয় পত্র দেখাতে হল (ভোটার কার্ড, আধার কার্ড অথবা প্যান কার্ড)। এরপর অনুমতি নিয়ে হাঁটতে লাগলাম বর্ডারের রাস্তা দিয়ে। কাঁটাতারের পাশ বরাবর পিচের রাস্তা আর কয়েক হাত অন্তর অন্তর বি এস এফ-এর টহল। নদীর ওপারে বাংলাদেশ। এই নদীটির নাম ইছামতী। নদীর অন্যদিকে বাংলাদেশের যশোর জেলার ভুলোট গ্রাম। এখানে ইছামতী নদী হল ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের লোকজন, বাড়িঘর, দোকানপাট ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যায়।

হাওড়ার পদ্মপুকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ ভালোবাসেন কলমের আচঁড়ে কোন কিছু ফুটিয়ে তুলতে - ভ্রমণ কাহিনি ছাড়াও গল্প বা উপন্যাস। "অনুভূতি" নামের গল্পটি নিয়ে অভিজিত দত্তের পরিচালনায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

চলতে চলতে গোয়েচা লা

অভিষেক মারিক

~ জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকরুট ম্যাপ ~ জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকের আরও ছবি ~

"কাল সে তো দৌড়না পড়েগা।"
স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে মুখজোড়া হাসি ছড়িয়ে কথাগুলো বলল সাওয়ান। আমরা যথারীতি কোনও পাত্তা দিলাম না। সাওয়ান ওরকমই এতদিনে আমরা বুঝে গেছি। ঠাট্টাতামাসা করেই যাচ্ছে সবার সঙ্গে। সতের বছরের পাহাড়ি ছেলেটা খুব সহজেই এতগুলো অচেনা অসমবয়সী লোকেদের সঙ্গে মিশে গেছে।

আজ আমাদের ট্রেকের অষ্টম দিন। কোকচুরাং থেকে শোকা যাওয়ার এই পথ প্রায় ১০ কিলোমিটারের অবরোহণ। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পাহাড়ি পথে মাঝে মধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। গত সাতদিনে এরকম রাস্তা আর কোথাও পাইনি। এতটা পথ পেরিয়ে আজকে তাই প্রথমবার বিরক্ত লাগছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় এই আশাতে জোরে হাঁটতে শুরু করে টাল সামলাতে না পেরে দুই-তিন বার আছাড়ও খেলাম।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই সিকিমের গোয়েচা লা যাওয়ার স্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসেছিল। গত কয়েক বছর ধরে যখন বন্ধুদের বলে কয়েও চিঁড়ে ভিজল না, তখন বুঝলাম "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।" কিন্তু এই ট্রেকে একলা চলতে গেলে পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাওয়ার চান্স। তাই ইন্টারনেটে অনেক গবেষণা করে একটি নামজাদা ট্রেকিং এজেন্সির সঙ্গে শরতের পেঁজা মেঘেদের সাথী করে নেমে পড়লাম গোয়েচা লা-র পথে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেকের বেসক্যাম্প ইয়ুকসামে যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে সূয্যিমামা পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়েছেন। একদা সিকিমের রাজধানী ছিল পশ্চিম সিকিমের এই ছোট্ট নিরিবিলি শহর। শহরের প্রবেশপথেই সুন্দর বৌদ্ধ মঠ ও প্রার্থনা পতাকাবেষ্টিত মায়াবী হ্রদ মন ভালো করে দেয়।
ইয়ুকসামের হোমস্টেতে ট্রেক গাইড তাশি আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। বছর তেইশের লম্বা ছিপছিপে নেপালি যুবক তাশি মুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বললেও তার চোখের কোণে এক চিলতে হাসি। বাঙালি, মারাঠি, তেলেগু, আফ্রিকান, ফরাসী ও দিল্লীবাসী সহযোগে আমাদের সতেরো-জনের যাত্রীদল যেন এক ছোট্ট বিশ্ব। নৈশাহারের পর তাশি যখন ট্রেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছিল, দেহে মনে এক রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। পরের দিন থেকে সেই স্বপ্নযাত্রার শুরু!

সেদিন রাতে উত্তেজনায় ঠিকমত ঘুম হল না। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লাম। মনোময় আকাশ মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে ঝলমলে হিমালয়। আবার ভালবেসে ফেললাম এই হাজার হাজার বছরের পুরনো বুড়োটাকে। সকাল নটা নাগাদ প্রাতরাশের পরে শুরু হল পথ চলা। গুগুল, হোয়াটস্‌অ্যাপ, ফেসবুকের ধরাছোঁয়ার বাইরে ন'দিনের অন্য এক জীবন। পাকদণ্ডী বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে চললাম আমরা - সতেরজন নগরবাসী, তাশি ও তার সঙ্গে দশজনের সহকারী দল এবং মালবহনকারী কিছু টাট্টু ঘোড়া। ঘন চিরহরিৎ জঙ্গলের আকাশচুম্বী গাছের পাতার ফাঁকের নীলাকাশের নকশা, পাহাড়ি অজানা পাখির কিচির-মিচির ডাকে গাছের ডালে লুকোচুরি খেলা, সন্নিকটে বয়ে চলা আপাত অদৃশ্য প্রেকচু নদীর গর্জন, ভিজে মাটি ও বন্য ঝরাপাতার মাতাল গন্ধ - আদিম জগতের এক দ্বার খুলে দিল কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান।

প্রেকচু নদীর ওপরে ঝুলন্ত সেতু

সারা পথ জুড়ে অজস্র বরফশীতল ঝোরা। তিনটে সুদৃশ্য ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে চড়াই-উৎরাই বেয়ে সেদিনের ক্যাম্পসাইট সাচেন পৌঁছাতে একটা বেজে গেছিল। ইয়ুক্সাম থেকে আট কিমি দূরে সাত হাজার ফিট উচ্চতার সাচেনের কোনও নৈসর্গিক দৃশ্য উপস্থাপনের দায় নেই। চারদিকে গভীর জঙ্গলে ঘেরা বলে দিনের বেলাতেও আঁধারময় ও স্যাঁতস্যাঁতে। কিন্তু তাশি জানাল পরবর্তী ক্যাম্প দশ কিমি দূরে। সাচেনে ক্যাম্প না হলে একদিনে আমাদের আঠেরো কিমি পথ পাড়ি দিতে হত যা আমাদের পক্ষে কষ্টকর ও ক্ষতিকারকও। অলস সময় পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতা ও উনো কার্ডের আসরে কেটে গেল। দিনের শেষে ডিনার করে যখন আমরা যে যার টেন্টের ভেতর স্লিপিং ব্যাগে সিঁধলাম তখন সবে সন্ধ্যা সাতটা। সকাল ছ'টা না বাজতে বাজতেই টেন্টের বাইরে হট্টগোল। ঘুমমাখা চোখে বাইরে উঁকি মেরে দেখি একটা রোগা-পাতলা স্পাইক হেয়ারকাট মারা ছেলে ও তার সঙ্গে বছর পঁচিশের বুদ্ধিদীপ্ত স্বাস্থ্যবান এক যুবক মহোৎসাহে প্রতি টেন্টে গিয়ে সবাইকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে গরম গরম চা পরিবেশন করছিল। সাওয়ান ও বুদ্ধা। এলাচ-আদার তৃপ্তিদায়ক চা দেহটাকে চাঙ্গা করে তুলল। এক প্লেট পোহা উদরস্থ করে সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় দুই কিলোমিটার অল্প বিস্তর ওঠানামার পরে সামনে দেখা দিল খরস্রোতা প্রেকচু নদী যদিও হাতের নাগালের বাইরে। যে পাহাড়কে দুভাগে চিরে প্রেকচু গর্জন করতে করতে ফেনিল ধারায় বয়ে গেছে সেই পাহাড়দুটোকে যুক্ত করেছে কংক্রিটের এক ঝুলন্ত ব্রিজ। ঠাণ্ডা হাওয়াতে পত্ পত্ করে ডানা মেলে উড়তে থাকা বাহারি তিব্বতি প্রেয়ারফ্ল্যাগে মোড়া এই সেতু এতটাই মনোরম যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কোথা দিয়ে বয়ে গেল ঠাহর করতে পারলাম না।

তাশি জানাল ব্রিজের পরে দুদিন টানা চড়াই। তাই সবাই যেন ধীরে সুস্থে আপন সুবিধানুসারে ওপরে ওঠে। তা নাহলে ক্লান্তি আসবে, মাউন্টেন সিক্নেস্ হওয়ার প্রবল চান্স। তাশির কথা শিরোধার্য করে আমরা এগিয়ে চললাম শম্বুক গতিতে। আকাশে মেঘের আনাগোনা অনেক বেড়ে গেছে। চলতে চলতে বাখিম নামক এক জায়গাতে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা বারো ছুঁইছুঁই। বাখিম গ্রামের পরিধি দু-তিনটে ছোট বাড়ি ও একটা টী-স্টলেই সীমাবদ্ধ। ধোঁয়া ওঠা গরম ম্যাগি দিয়ে পথ চলার রশদ যোগাতে যোগাতে দেখলাম ধূসর মেঘ সারা উপত্যকা ঢেকে ফেলল।

দু'কিলোমিটার চড়াইয়ের পরে পৌঁছলাম শোকাতে। চারদিকে সুউচ্চ চিরহরিৎ গাছের সারির মধ্যে শোকা একটা উন্মুক্ত অঞ্চল। মিলন, আমাদের সাপোর্ট স্টাফের একজন, বলল এত মেঘ না থাকলে চারদিকে পাহাড়ের মেলা দেখা যেত। শোকাতে ঠাণ্ডা অনেকটাই বেড়ে গেছে, হাওয়াও চলছে ভালো। সাচেনের মত আর্দ্রতা এখানে নেই। কিন্তু মেঘগুলো যেন পেছন ছাড়ছে না! এখানে যা কিছু কুঁড়েঘর বা টেন্ট আছে সবকিছুই ট্রেকিংয়ের জন্য। কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানে তাছাড়া সাধারণ মানুষের বসবাসের অনুমতি নেই। কিন্তু তার মাঝেও একটা সুন্দর বৌদ্ধমঠ ছোট্ট এক পুকুরের ধারে মাথা তুলেছে। তাশির কাছে পরে জেনেছিলাম 'শো' শব্দের অর্থ ছোট ও 'কা' শব্দের অর্থ পুকুর। সেই পুকুরের ওপরে ফুটে ওঠা মঠ-মেঘ-আকাশ-গাছের সম্মিলিত মায়াবী প্রতিবিম্ব দেখলে মনে হয় নামটা সত্যিই সার্থক। শুকনো ধূপের গোছা কেউ মঠের দরজায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অচেনা ভালোলাগার গন্ধে মনটা ভরে গেল। ধর্মাচারে বিশ্বাস না থাকলেও ভগবানকে সাক্ষী রেখে বললাম "বেহায়া সব মেঘের দল, এবার তোরা উড়ে চল।"

মঠ থেকে ক্যাম্পসাইটে ফেরার সময়ে শুনলাম কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি আমাদের টেন্টের ঠিক পেছনে নীল আকাশে মাথা তুলেছে পান্ডিম, কাবুরু ইত্যাদি শৃঙ্গরা। দিনের শেষে পড়ন্ত আলোতে জ্বলন্ত পাহাড় অবর্ণনীয়। মঠের দিকে তাকিয়ে মন থেকে বললাম "ধন্যবাদ।"

"ফেদং আ গয়া"।
অস্ট্রেলিয়ানিবাসী সত্যজিতের কথায় আগের দিনগুলোর স্মৃতির জাল ছিঁড়ে বর্তমানে এসে পৌঁছলাম। ভাবতে ভাবতে কখন যে আধা রাস্তা নেমে এসেছি খেয়াল নেই। ফেদংয়ে কোনও জনবসতি নেই। খোলামেলা এই জায়গা শুধুমাত্র বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। জোংরি, কোকচুরাং ও শোকা – এই তিন জায়গা থেকে তিনটে পথ এসে একসাথে মেশে। একটু বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে গেলাম শোকার দিকের অবরোহণের পথে। এই রাস্তার নতি অনেকটাই বেশি। কিছুক্ষণ পরে হাঁটু ব্যথা করতে লাগল। মনে পরে গেল এই রাস্তাতেই তৃতীয় দিন এসেছিলাম জোংরি যাওয়ার পথে। সেদিনের কথা ভুলি কি করে!

সেদিন ভগবান মজার খেলা খেলে এক চিলতে পাহাড় দেখিয়ে আমাদের লোভ বাড়িয়ে আবার মেঘের জাল ফেলে দিল। শোকায় সেদিন রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি। পরের দিন সকালেও একই অবস্থা। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রওনা দিলাম জোংরির পথে। শোকা থেকে জোংরি প্রায় আট কিলোমিটারের এই পথ খাড়া ওপরে উঠে গেছে। পিঠের রুক্স্যাক, বেহায়া বৃষ্টি আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওপরে ওঠা আরও কঠিন। যত সামনে এগোলাম বড় গাছের সংখ্যা কমতে লাগল। রডোডেন্ড্রন গাছের যেন মেলা বসে গেল। রডোডেন্ড্রনের এই প্রাচুর্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্কের বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ। এপ্রিল-মে মাসে এখানে ফুলের জলসা লেগে যায়।

ফেদং পেরিয়ে সেদিন যখন জোংরিতে পৌঁছলাম তখন বেলা তিনটে বাজে। অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে টেন্টে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। সবাই মিলে একটা কাঠের কুটিরে মাথা গুঁজলাম। সন্ধ্যাবেলার আড্ডার আসরে জানা গেল পুনেনিবাসী বছর পঞ্চাশের মৃণ্ময়ী-চারুতাদের গানের চর্চা আছে। বসে গেল মারাঠি-বাংলা-হিন্দি গানের আসর। অনেকবার ছুক্ ছুক্ করতে করতে অবশেষে বুদ্ধা এসে ধরল নেপালি গানের মেঠো সুর। গানের জোয়ারে ভেসে গেল দিনের সব ক্লান্তি।

জোংরি

ভোর ছটা নাগাদ উঠে দেখি বৃষ্টি থেমে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। অবিলম্বে জোংরি ভ্রমণাভিযান শুরু। প্রায় তেরো হাজার ফিট উচ্চতায় জোংরি বিশাল এক মিডো (meadow)। অসংখ্য ধূপ-গাছের ঝোপে ভরা ও ছোট-বড় পাহাড়ি ঝোরায় ঘেরা জোংরি রৌদ্রছায়ায় অপার্থিব হয়ে উঠেছিল। ৩৬০ ডিগ্রী ভিউ পাওয়ার জন্য যতক্ষণে জোংরি টপে (জোংরির সবচেয়ে উঁচু স্থান, উচ্চতা - ১৩,৬৭৫ ফিট) উঠলাম ততক্ষণে আবার মেঘের পর্দা ঢেকে ফেলল তুষারধবল শৃঙ্গদের মুখ। জোংরি টপে গিয়ে দেখি আমাদেরই দুই সহযাত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা শেনয়েট ও আয়ালা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে। শেনয়েট ও আয়ালার পাল্লায় পড়ে যেতে হল জোংরির ছোট্ট মনাস্ট্রিতে। এই দিনটায় আমাদের কোনও গন্তব্য নেই। উচ্চতার সঙ্গে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় মানিয়ে নিতে আজকে জোংরিতে আমাদের বিশ্রামের দিন। তাই মঠের বাইরে ছোট ছোট বৌদ্ধস্তূপগুলোর পাশে বসেই দিনের অর্ধেক কেটে গেল।

ট্রেকের পঞ্চম দিনে আমরা জোংরি ছেড়ে পা বাড়ালাম পরবর্তী ক্যাম্পসাইট থানসিংয়ের পথে। আকাশ জুড়ে আজও ছড়িয়ে আছে মেঘেদের ঘরবাড়ি। এদিন সকাল সকাল জোংরি টপ থেকে সূর্যোদয় দেখার প্ল্যানও ভেস্তে গেছিল একারণে। থানসিং ও জোংরি সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে প্রায় একই উচ্চতায় হলেও দশ কিলোমিটারের ওঠানামার পথ। জোংরির সুবিশাল চারণভূমির মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। চলার পথে দেখা পেলাম বরফগলা জলের স্নিগ্ধ হ্রদ লক্ষ্মী-তালের। আকাশে মেঘ থাকলেও এদিনের নিসর্গ সত্যিই মাতাল করে দেয়। জোংরি থেকে প্রায় ছ'কিমি অবরোহণের পথে চলে পৌঁছলাম কোকচুরাং। এই সেই কোকচুরাং যেখানে সপ্তম-দিনে ফেরার পথে এসে থাকব। উন্মাদ প্রেকচু এই প্রথমবার হাতের ছোঁয়ার মধ্যে। আকাশের মেঘ নিচে নেমে এসে এখানে এক রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি দু'তিনটে ছোট ছোট সেতু নদী অতিক্রম করার একমাত্র পথ। এই দিকের পাহাড়ের রূপ কিছুটা আলাদা। রডোডেন্ড্রনের সাম্রাজ্য এখানে নেই বললেই চলে। তার বদলে স্থান করে নিয়েছে লাল-হলুদ পাতার কিছু শ্যাওলা ও গুল্মজাতীয় গাছ। মাঝে মাঝে গাঢ় নীলের ছোঁয়াও চোখে পরে। আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে এই সব গাছের নাম। সারা পথ ধরে প্রেকচু আমাদের ডানদিকে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে মেঠো পথে কাটাকুটি খেলে জলের ধারারা প্রেকচুতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

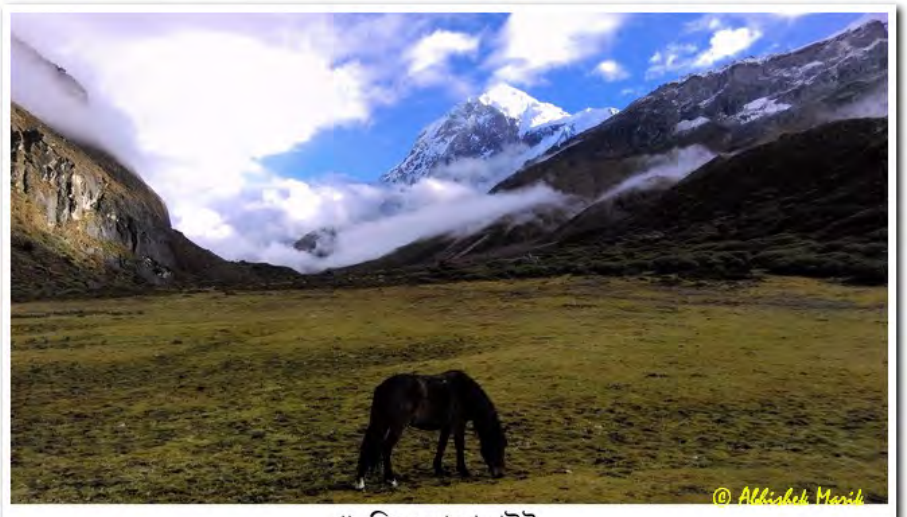

থানসিং ক্যাম্পসাইট

থানসিংকে একটা বিশাল খেলার মাঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। চারদিকে হঠাৎ মাথা তোলা হাজার ফুটের দেওয়ালরূপী পর্বতের মাঝে সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমি। এখানে পৌঁছে লাঞ্চ শেষ করেই কেউ আর ক্রিকেট খেলার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। প্লাস্টিকের গোলা ও কাঠের পাটাতন দিয়ে শুরু হয়ে গেল 'ভ্যালি ক্রিকেট'-এর আসর। সন্ধ্যাবেলার স্যুপ খেতে খেতে সবাই মিলে তাশিকে ধরলাম তার পর্বত অভিযানের গল্প বলতে। তাশি একের পর এক তার মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করার গল্প, প্রথম সামিটের অভিজ্ঞতা, ট্রেকিং জীবনের স্মৃতি বলে গেল আর আমরা দৈনন্দিন গতে বাঁধা জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো মানুষেরা গোগ্রাসে সেগুলো গিললাম। মনটা আলাদা রকম ভালোলাগায় ভরে গেল।

পরেরদিন লামুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল দুপুরের পরে। সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও ন'টা বাজতে না বাজতেই থান্‌সিং সাদা মেঘে ঢেকে গেছিল। লামুনে থান্‌সিং থেকে চার কিমি দূরে মাউন্ট পান্ডিমের পাদদেশে অবস্থিত। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রায় সমতল পথ বলে পৌঁছাতে মাত্র এক ঘণ্টা মত লাগল। চারদিকের বরফ-ঢাকা শৃঙ্গের মাঝে এই ক্যাম্প-সাইটে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দেয়। পাহাড় থেকে উপত্যকার দিকে বয়ে চলা এই ঠাণ্ডা হাওয়াই আবার শাপে বর হল। অবাধ্য মেঘগুলোও উড়ে গেল তার সঙ্গে। তখনও সূর্যাস্তের একঘণ্টা বাকি। কেউ যেন পাহাড়গুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চোখ ঝলসানো এই রূপ দেখে আমরা সবাই হতবাক।
...
চিন্তায় ডুবে যাওয়ার জন্যই হোক বা অতিরিক্ত চলার পরে হাঁটুর ব্যথাটার জন্যই হোক - চলতে চলতে হঠাৎ হড়কে গেলাম।
'আরে, সামলে চল। এখানে তো আর কাদা নেই রে! পড়ে গেলি কি করে?'
দেখি কলকাতার জুপিটারদা একটু পিছন থেকে নেমে আসছে। কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে বোকার মত হাসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গা-হাত-পা ঝাড়লাম।
'আর একটুখানি! ওই দেখ শোকা দেখা যাচ্ছে।'
সত্যি তো! পাহাড়ের ওপর থেকে লিলিপুটের দেশের মত ফুটে উঠেছে শোকার মঠ, ছোট জলাশয় ও ট্রেকার্স হাটগুলো। আধঘণ্টা ধীরে ধীরে হেঁটে পৌঁছলাম শোকার ক্যাম্প-সাইটে। বাকি সবাই আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা শুরু হল ডাম্ব-শারাডের খেলা। টেন্টগুলোর পাশে ট্রেকার্স হাটে আমরা খেলছিলাম। হঠাৎ তাশিরা আমাদের জোর করে বাইরে বের করে দরজা জানলা বন্ধ করে দিল। কৃত্রিম ফতোয়া জারি করে বলল আমরা যেন ভেতরে না ঢুকি যতক্ষণ না পারমিশন দেওয়া হয়। আধঘণ্টা পরে আমাদের ভেতরে ডাকা হল। যা দেখলাম তা অভাবনীয়। তাশিরা মোমের আলোতে সারা কটেজ ভরিয়ে দিয়েছে। টেবিল জুড়ে সাজানো হয়েছে রকমারি খাবার - পাহাড়ের ওই উচ্চতায় কি করে বানাল ওরা! তাদের মধ্যে সবচেয়ে অকল্পনীয় হল এক চকোলেট কেক গোলাপি-সাদা ক্রিম দিয়ে সাজানো। আমাদের সার্থকভাবে গোয়েচা লা পৌঁছানোর জন্য ট্রেক কোম্পানির তরফ থেকে উপহার।

চোখের সামনে আগের দিনটা আবার ঝলসে উঠল। সত্যি তো! এই তো কালকেই আমরা গোয়েচা লা দেখে এলাম। লামুনেতে পরশুদিন সূর্যাস্তের পরে আমরা নৈশাহার করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। পরেরদিন দীর্ঘ পথের যাত্রা। সূর্য ওঠার আগে গোয়েচা লা যেতে হবে এবং তারপর লামুনেতে ফিরে লাঞ্চ করে আবার কোকচুরাংয়ের দিকে যেতে হবে। রাত একটা নাগাদ উঠে ফ্রেশ হয়ে দু'টোর মধ্যে বেড়িয়ে পড়তে হল গোয়েচা লার উদ্দেশ্যে। হেড-টর্চের আলোতে অন্ধকারের যাত্রীরা পাহাড়ে যেন অগুন্তি জোনাকির উৎসব শুরু করে দিল। লামুনে থেকে একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম চাঁদের আলোয় ফুটে উঠেছে এক হ্রদ - সমিতি লেক। সেদিন ফেরার পথে দিনের আলোয় এই লেকই ছড়াচ্ছিল শতবর্ণের ছটা। লেকের পাশ কেটে চড়াইয়ের পথে এগোতে থাকলাম। এখানে চারদিকের ভূপ্রকৃতি অনেকটা কড়াইয়ের মত। আমরা যেন সেই কড়াইয়ের তলা থেকে ক্রমশ কানার দিকে উঠে চলেছি আর চারদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গের সারি কড়াইয়ের কানার বাইরে থেকে অতন্দ্র প্রহরীর মত আমাদের দিকে চেয়ে আছে। যত ওপরে উঠলাম দূরের তুষারধবল শৃঙ্গগুলো তত এক একটা বিশালকায় দৈত্যের চেহারা নিল।

গোয়েচা লা ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

গোয়েচা লা ভিউপয়েন্টে পৌঁছলাম চারটে নাগাদ। প্রায় সাড়ে পনের হাজার ফিটের উচ্চতায় এই ভিউপয়েন্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘা, উত্তর কাবুরু, দক্ষিণ কাবুরু, গোয়েচা ও নাম না জানা আরও অনেক শৃঙ্গ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যেন আমাদের জন্যই যুগ-যুগান্তর ধরে অপেক্ষমান। চাঁদের আলোয় নীলচে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন কোন এক স্বপ্নলোকের দেশ। তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দিনের প্রথম আলোতে দুধ-সাদা গিরিমালা গেরুয়া রঙের চাদরে গা ঢাকল। উত্তেজনায় সবাই চিৎকার করে উঠলাম। আকাশে আজ এক চিলতে মেঘ নেই। অবশেষে সহায় হল ভগবান। প্রভাতের নরম মিঠে আলোতে হিমালয় যেন হেসেই চলল। ভুবনমনমোহিনী রূপ যেন এতদিনের পথ চলার ক্লান্তি হরণ করল। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অচেনা অজানা মানুষগুলোর জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত এক সুতোয় বেঁধে দিল এই হিমালয়।
...
শোকার এই ছোট্ট হাটে এখন উৎসবের আমেজ। বুদ্ধা নেপালি গান 'রেশম ফিরিরি' ধরেছে। তাশি তার গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে নাচছে। সবাই মিলে গলা মেলালাম, নেচে উঠলাম গানের তালে তালে। সবাই মিলে একসঙ্গে অদ্যই শেষ রজনী। ইয়ুকসামে পৌঁছে আমাদের সহকারী দল আলাদা হয়ে যাবে। তারপরের দিন আমরা আবার ফিরে যাব সমতলের দূষিত দুনিয়ায়। হয়তো আর দেখা হবে না কোনোদিনও। শুধু ফেসবুকের অ্যালবাম বা হোয়াটস্‌অ্যাপের ছবিগুলো ধরে রাখবে এই সুন্দর মুহূর্তগুলো। বুদ্ধা সুরেলা কণ্ঠে শুরু করল - 'লাগ যা গালে।' মদনমোহনজীর সুরে

কালজয়ী সেই গানে আমরাও যোগ দিলাম। প্রেমের গান হলেও এই মুহূর্তে এর চেয়ে যথাযথ আর কি হতে পারে! 'ফির য়ে হসিন রাত হো না হো, সায়দ ফির ইস্ জনম মে মুলাকাত হো না হো!'

কোকচুরাং -এ প্রেক চু

~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকের আরও ছবি* ~

কলকাতার বাসিন্দা আই টি প্রফেশনাল অভিষেক মারিক ভালোবাসেন বেড়াতে। মূলতঃ ট্রেকিং। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তো বটেই, এমনকী বিদেশেও। নির্জন শান্ত পাহাড়ি পরিবেশ আর সেখানকার সরল মানুষজন তাঁকে আকর্ষণ করে। সেই টানেই বারবার ছুটে যান হিমালয়ে। এর পাশাপাশি স্থানীয় খাবার চেখে দেখতেও তিনি উৎসাহী। খাওয়া ছাড়া বেড়ানোর মানে আছে নাকি?

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভূস্বর্গ কিন্নরে

সুদীপ্ত ঘোষ

~ কিন্নরের তথ্য ~ কিন্নরের আরও ছবি ~

রোজকার শহুরে কোলাহল, দশটা-পাঁচটার লড়াইয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একরকম ডুম করেই। গন্তব্য কিন্নর, হিমাচল প্রদেশ। সময়টা অক্টোবরের মাঝামাঝি, সেই হিসাবে ভরা মরসুম। ট্রেনের রিজার্ভেশন তখন অলীক কল্পনা। অগত্যা শেষ মুহূর্তে কিছু টাকা বেশি গচ্চা দিয়ে ফ্লাইটের টিকিট বুক করা হল, আর হোটেলের জন্য রেকং পেও-নিবাসী বন্ধুর স্মরণাপন্ন হতে হল। ভরা মরসুমে মৌখিক আশ্বাস সম্বল করেই যাওয়া ঠিক হল। নেহাতই দায়ে পড়ে। কী আশ্চর্য ! এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও শেষ মুহূর্তে সহধর্মিণী ছাড়াও আরও দুই সঙ্গী জুটে গেল, বন্ধু জিনিয়া আর কাকিমা। সব মিলে চারজনের ছোট্ট একটা গ্রুপ। অতঃ কিম, বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে 'দুগগা' বলে বেরিয়ে পড়লাম। জয়পুর থেকে আকাশপথে চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টে থেকে ইনোভা, সঙ্গে সারথি বিট্টু। চণ্ডীগড় থেকে কল্পার দূরত্ব বেশি হওয়ায় এবং ফ্লাইটের সময় সুবিধাজনক না হওয়ায় মাঝে রাতটা কুফরিতে কাটাবো ঠিক হল।

কুফরি

চণ্ডীগড় থেকে কুফরি সড়কপথে ১৩০ কিলোমিটার। সময় লাগে চার ঘণ্টার মতো। কিন্তু চণ্ডীগড় থেকেই শুরু হল জ্যাম। শম্বুক গতিতে শুরু করে পঞ্চকুলা, পিঞ্জর পেরিয়ে জাতীয় সড়ক-৫ ধরে ছুটে চললাম। কিন্তু বিধি বাম, মাঝে মধ্যেই রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। বেশ কিছু জায়গায় জ্যাম কাটিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে, ঠোক্কর খেতে খেতে সিমলা যখন পৌঁছালাম রাত আটটা বেজে গেছে। প্রাচীন ব্রিটিশ শৈলশহর তখন ঘুমের চাদরে ঢাকা। ইতিউতি দু-চারটে দোকান খোলা। যার মধ্যে বেশিরভাগই রেস্তোরাঁ। সিমলা থেকে কুফরি খুব কাছে, ১৫ কিলোমিটারের মতো। পাহাড়ি রাস্তায় আরও একঘণ্টা। পাহাড়ের মাথায় ছিমছাম এক শহর। সিমলার মতো কংক্রিটের জঙ্গল এখনও থাবা বসায় নি। কুফরি হলিডে রিসর্টে পৌঁছে মনটা খুশিতে ভরে গেল। বেশ সুন্দর হোটেল। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। রাতের ডিনার বুফে হলেও আয়োজন খুব ভালো। ভেজ, নন ভেজ দুরকমই আছে। তবে মন জয় করে নিল শেষ পাতের গরমাগরম জিলিপি আর রাবড়ি। একদম পারফেক্ট শো-স্টপার।

পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে ঘোড়ার পাল - কুফরি

ঘুম ভাঙল ভোরে। এখনও ঠাণ্ডাটা জমিয়ে পড়েনি। কুফরি শীতকালের হিলস্টেশন হিসাবে বিখ্যাত। তাই অক্টোবরে ট্যুরিস্টের তেমন ভিড় নেই। হাল্কা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে হিমালয় জানলার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে ঘুমভাঙা পাখির দল সকালের আলাপচারিতায় ব্যস্ত। কে জানে কিসের এত ব্যস্ততা। একটু পরে পাহাড়ি পথ বেয়ে লাইন দিয়ে উঠে এলো ঘোড়া, সামনে সহিস। হোটেলের সামনেই ওদের আস্তানা। পাহাড়ি রাস্তায় সওয়ারির অপেক্ষায়। খানিক বাদেই হাজির একের পর এক টুরিস্ট বোঝাই গাড়ি। দলবেঁধে চলল সওয়ার হতে। আমাদের কুফরির মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে। সিমলা থেকে কল্পার দুরত্ব ২৫০ কিলোমিটারের মতো, পাহাড়ি রাস্তায় আট ঘণ্টার ধাক্কা। তাই বেরিয়ে পড়লাম। জলযোগটা পথেই সেরে নিতে হবে।

কল্পা

কুফরি থেকে ফাগু, থিয়গ, নারকান্ডা, রামপুর, ওয়াংটু, টাপরি, কারছাম পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় রেকং পেও। রেকং পেও এর ঠিক ওপরেই (৭ কিলোমিটার) অবস্থিত কিন্নরের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম কল্পা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২৯৬০ মিটার। রেকং পেও থেকেই কিন্নর কৈলাস রেঞ্জ দেখা যায়। রেকং পেও পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে গেল। পশ্চিম থেকে গোধূলির আলো পুরো রেঞ্জে পড়েছে। কল্পা থেকে কিন্নর কৈলাস রেঞ্জের সৌন্দর্য তো অবিশ্বাস্য। তুষারশৃঙ্গগুলো যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। হোটেল সাংগ্রিলা আমাদের গন্তব্য। হোটেলে যখন পৌঁছালাম তখনো সূর্যাস্ত হয়নি। লাগেজ রেখে পৌঁছালাম পাঁচ তলায়। এটা হোটেলের অ্যাটিক কাম লাইব্রেরি। নানা রকম বইয়ে ঠাসা। কলকাতা নিয়ে শ্রদ্ধেয় নিমাই ভট্টাচার্যের বই চোখে পড়ল। এছাড়া বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন বিষয়ের বই চোখে পড়লো। পুরো সংগ্রহটা রীতিমতো তারিফযোগ্য। লাইব্রেরির লাগোয়া ব্যালকনি, যেখান থেকে রেঞ্জটা করমর্দনের দূরত্বে। পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলোয় পুরো রেঞ্জটা কল্পনাতীত সুন্দর হয়ে ওঠে। সূর্যাস্ত দেখে একটু ফ্রেশ হয়ে আবার এসে বসলাম লাইব্রেরিতে। মিউজিক সিস্টেমে লো ভল্যুমে বেজে চলেছে ভগবান বুদ্ধের মন্ত্রধ্বনি। পাশে ধ্যানমগ্না বিদেশিনি। আলমারি থেকে স্লো লেপার্ডের ওপর লেখা একটি বই টেনে নিলাম। কয়েকটা পাতা সবে পড়া হয়েছে, এমন সময় বাকিরা এসে হাজির। সঙ্গে কফি মগ। জিনিয়ার আবার ক্রসওয়ার্ড, স্ক্র্যাবেলের এর নেশা। স্ক্র্যাবেল বোর্ড পেতেই শুরু হল খেলা। ডিনারের ডাক পেয়ে খেলা যখন সাঙ্গ হল, দেখা গেল জিনিয়াই জিতেছে।

কল্পা থেকে কিন্নর কৈলাস রেঞ্জ

খুব সকাল সকাল উঠে পড়লাম সানরাইজ দেখতে। চারদিকে আপেল বাগানের মাঝে আমাদের হোটেল। গাছ থেকে তখন আপেল পাড়া চলছে। দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি। রেঞ্জটা তখনও আলো-আধাঁরিতে ঢেকে। ক্যামেরা বাগিয়ে ট্যুরিস্টের দল বিভিন্ন হোটেলের ছাদে, ব্যালকনিতে তৈরি। সুয্যি মামা উঁকি দিলেই পাকড়াও করবে। সূর্য মুখ দেখানোর আগেই আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল হোলিখেলা। বরফে ঢাকা রেঞ্জের পিছনে কে জানি মস্ত টর্চ জ্বেলে ধরেছে। সকালের গোলাপি আলোয় শৃঙ্গগুলো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। অবশেষে সূর্যদেব উঁকি দিলেন। কল্পা থেকে কিন্নর কৈলাস রেঞ্জের আরেকটি আকর্ষণ হল শিবলিঙ্গ দর্শন। শিবলিঙ্গটি আদতে একটি ৭৯ ফুট দীর্ঘ পূর্ণ শৈলখণ্ড (মোনোলিথ)। যেটা দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলোয় বিভিন্ন রঙে ধরা পড়ে। আলোকরশ্মির আপাতন কোণের ওপর নির্ভর করে সারাদিন ধরে চলে এই রঙের খেলা। হোটেলের লাইব্রেরির ব্যালকনিতে রাখা দূরবীনে চোখ লাগিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম সেই আপাত অলৌকিক অভিজ্ঞতা। সানরাইজ দেখে বেরিয়ে পড়লাম। চারিদিকে শুধু আপেলের বাগান। গ্রিন আপেল, গোল্ডেন আপেলও কম নেই। বেশ কিছু জায়গায় আপেল প্যাকিংপর্ব চোখে পড়ল।

রোঘি গ্রাম থেকে হিমালয়

ব্রেকফাস্ট করে চললাম রোঘি ভিলেজ। কল্পা থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরত্বে প্রকৃতি তার ঝুলি উপুড় করে দাঁড়িয়ে আছে আপনার অপেক্ষায়। কিন্নরী জীবনযাত্রার একঝলক আপনার মন ভরিয়ে দেবে। যাওয়ার রাস্তাও কম রোমাঞ্চকর নয়। একদিকে খাড়াই পাহাড় তো আরেক দিকে গভীর খাত। সুইসাইড পয়েন্ট-এর বাঁকে ফোটোগ্রাফারদের ভিড় এড়িয়ে গিয়ে পড়লাম গ্রামে। চারদিকে অখণ্ড শান্তি। আর পাঁচটা পাহাড়ি আটপৌরে গ্রামের মতই। বাহুল্য বর্জিত। ছোট মন্দির, পাকদণ্ডী, কাঠের বাড়ি, আর হিমালয়। আপেল বাগান, পাইনের জঙ্গলের ফাঁক গলে একঝলক হিমালয়। বরফ তো চূড়াগুলো থেকে হাত বাড়িয়েই তুলে নেওয়া যায়। গ্রামে ঢোকার মুখেই বাঙালি কাকু আপেলের দরদাম নিয়ে ব্যস্ত চোখে পড়ল। আমরাও দলে ভিড়ে গেলাম। গোল্ডেন আপেল, গ্রিন আপেল সব কিছুই চেখে দেখা হল ।

একে একে ঘুরে নিলাম নারায়ণ-নাগিনি মন্দির, হু-বু-লান-কার মনাস্ট্রি। এছাড়া ঘুরে নিলাম ছবির মতো সুন্দর শহর রেকং পেও। রেকং পেও থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের কোঠি গ্রাম এবং চণ্ডিকা দেবীর মন্দির।

বিকেলে রেকং পেও থেকে ফিরে কফি মগ হাতে আড্ডা শুরু হল লাইব্রেরিতে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আড্ডা জমছিল না। গম্ভীর মুখে কফির মগে চুমুক দিচ্ছিলাম। ঘটনাটা নেহাত হেলাফেলার নয়। আজ পুরো দিন চেষ্টা করেও নাকোতে যোগাযোগ করা যায়নি। এতদূর এসে নাকো না গিয়ে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয়না। কিন্তু বুকিং ছাড়া নাকোর মতো আপাত দুর্গম জায়গায় গিয়ে পড়লে কপালে বিড়ম্বনা লেখা থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে যোগাযোগের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু কোনও আশার আলোর দেখছিলাম না। সেই সময়েই দেখা পেলাম আমাদের এক শুভানুধ্যায়ীর, তিনি আর কেউ নন স্বয়ং দলাই লামা। না, স্বশরীরে নয়। দেওয়ালে ঝোলানো পোর্ট্রেট থেকে তাঁর হাস্যমুখের ছবি আর আশ্বাসবাণী আমাদের বরাভয় দিল। 'মেডিটেশন অন ডাইং।' "আজ নয় কাল, হয়তো বা পরবর্তী মুহূর্তেই সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে এটা নিশ্চিত জেনেও আমরা সব কিছু আঁকড়ে ধরি। এটা ভেবে, যেন আদি অনন্তকাল জীবিত থাকতে এসেছি।" তাই এই স্বল্পায়ু জীবনের বাকি দিনের কথা চিন্তা না করে আবার পথে নামাই ঠিক হল। জীবনের মুহূর্তগুলোকে আরও একটু উপভোগ্য করে তুলতে।

রাতে ডিনারের জন্য বাইরে বেড়িয়ে পড়লাম। একটু স্বাদবদলের জন্য। বাইরে ঠাণ্ডাটা বেশ মনোরম। কাকিমা শাল জড়িয়ে বেশ পরিপাটি। একটু এগোতেই চোখে পড়লো 'হোটেল শিবালিক।' বাঙালি হোটেল। ম্যানেজার স্বপন চট্টরাজ মশাই খুব আন্তরিক। পাত পেড়ে ভাত, ডাল, আলুপোস্ত আর আলু দেওয়া খাসির মাংস। তোফা রান্না। রাঁধুনির হাত যেন সোনায় বাঁধানো। সেই স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে। ভুরিভোজের পর পরবর্তী দিনের জন্য দুশ্চিন্তাটা অনেকটা কমে গেলো। আর কে না জানে ভরপেট খাওয়ার পর মুখে পান নিয়ে বাঙালি আজীবন বিশ্বজয় করে এসেছে। সুতরাং এবারও তার অন্যথা হয় কেন।

নাকো

কল্পা থেকে নাকোর দুরত্ব ১০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। কল্পা থেকে নীচে নেমে রেকং পেও হয়ে ৫নং জাতীয় সড়ক ধরে আরও উত্তরের দিকে চলতে হবে। পথের অধিকাংশ সময় সঙ্গ দেবে সাটলেজ অর্থাৎ শতদ্রু। কল্পা থেকে সকাল সকাল রওনা হয়ে গেলাম। শতদ্রুকে ডান দিকে রেখে চলতে শুরু করলাম। একে একে আকপা, স্পেলো, পোহ ফেলে রেখে পৌঁছালাম স্পিতি আর শতদ্রুর সঙ্গমে। পথের বর্ণনা দিয়ে আর লেখাটা দীর্ঘায়িত করব না। তবে এটুকু বলতে পারি না গেলে জীবনে অনেক কিছু না দেখা থেকে যেতে পারে।

কল্পা থেকে নাকোর পথে

'খাব' গ্রামের রাস্তা থেকে কিছুটা এগিয়ে লোহার সেতু পার হয়ে প্রবেশ করলাম স্পিতি ভ্যালিতে। রাস্তার পাশে সবুজ বোর্ড আপনাকে লাহুল স্পিতিতে স্বাগত জানাতে তৈরি। রাস্তা এখানে আরও ভয়ঙ্কর এবং আরও সুন্দর। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। তার পাশে কোথায় লাগে রোলার কোস্টারের উত্তেজনা। এক দিকে সুউচ্চ পাহাড় তো আর এক দিকে অতল খাদের হাতছানি। গাছপালা ক্রমে কমে এলো, শুরু হল কাঁটাঝোপের মরুপ্রান্তর। কোল্ড ডেসার্ট। চারিদিকে বোল্ডারময় কর্কশ, ন্যাড়া পাহাড়। অদূরে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এসেছে বরফের হাল্কা আস্তরণ। তারই মাঝে সর্পিল রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলেছে। এখানে এক ফাঁকে বলে রাখি, কল্পা থেকে নাকোর পথে কিন্তু কোনো পেট্রল পাম্প নেই। তাই যাত্রা শুরু করার আগে রেকং পেও থেকে তেল ভরিয়ে নিতে ভুলবেন না।

নাকো তখনও চার কিমি, সূর্য তখন ঢলতে শুরু করেছে। রাস্তার ধারে একটা ধাবার দর্শন পেলাম। জনমানবহীন ধু ধু প্রান্তরে চা এর আশা জেগে উঠলো। কালক্ষেপ না করে গাড়ি থামিয়ে চা এর অর্ডার দেওয়া হল। ক্লান্ত ঠোঁটে চা এর কাপ, নীচে সুগভীর স্পিতি ভ্যালি, চারিদিকে আদিগন্ত হিমালয় ... সব মিলিয়ে বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম রোম্যান্টিসিজিম। যেখানে প্রেম, প্রকৃতি সব মিলে মিশে একাকার।

নাকো যখন পৌঁছালাম সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে। বিকেলের মনকেমনকরা মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে স্পিতি ভ্যালি তখন স্বর্গীয়, অনির্বচনীয়। হিমালয়ের কোলে পাহাড় ঘেরা ছোট্ট একটা জনপদ 'নাকো', মধ্যে ছোট্ট একটি লেক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৩৬৬২ মিটার। ছবির মতো সুন্দর। হয়তো সৌন্দর্যের দিক থেকে সো মোরিরি বা প্যাংগং লেকের রমণীয় সৌন্দর্যের পাশে নেহাতই নাবালক। কিন্তু গ্রাম্য কিশোরীর মতো তার নিষ্পাপ রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। নয়নাভিরাম দৃশ্য কোন শিল্পীর অলীক কল্পনাকেও হার মানায়। ইঞ্চি মেপে প্রতিটা গাছ, পাহাড়, আকাশ যেন শিল্পীর ক্যানভাস থেকে তুলে আনা। ব্যাকড্রপে গ্রাম্য ঘরবাড়ি যেন ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা কোনও প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়বাহী। ফটোগ্রাফার হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেদিকে প্রাণ চায় ক্যামেরা ফ্রেম করুন, হলফ করে বলতে পারি আপনার তোলা ছবি টেবিলে রাখা ক্যালেন্ডারকেও হার মানাবে। তুষারশৃঙ্গ ছুঁয়ে নেমে আসা হিমেল হাওয়ার স্রোত পড়ন্ত বিকেলে হাড় কাঁপিয়ে দিল। দেখতে দেখতে পাহাড়ের গা বেয়ে, উইলো আর পপলার গাছের হলুদ পাতা ছুঁয়ে মন কেমন করা সন্ধ্যে নেমে এল।

গোধূলি আলোয় নাকো গ্রাম

আমাদের আস্তানা কিন্নর ক্যাম্প। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সারি দিয়ে সতেরোটা স্যুইসস্টাইল লাক্সারি টেন্ট। সঙ্গে মাল্টিকুইজিন রেস্টোরেন্ট। প্রতিটা টেন্ট আলাদা আলাদা শৃঙ্গের নামে নামাঙ্কিত। তাঁবুর পিছন থেকেই ধাপে ধাপে উঠে গেছে খাড়াই পাহাড়। প্রতিটা ধাপে সার দিয়ে আপেল গাছ। কোমর সমান উঁচু গাছগুলো আপেলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সন্ধ্যে আঁধার একটু ঘন হতেই শুরু হল হাওয়ার দাপট। হাওয়ার দাপটে তাঁবুর তখন নাভিশ্বাস উঠছে। বাইরে পারদ তখন হিমাংক ছুঁয়েছে। একটু পরে হাওয়ার দাপট কমে এলে বাইরে এলাম। চারদিক পাহাড় ঘেরা ঝকঝকে আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। দূরে পাহাড়ের চূড়ার বরফ জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে আছে। কাজকালো আকাশে ফুটে উঠেছে লক্ষ কোটি তারা। নক্ষত্রমন্ডলের ভিড়ে আকাশগঙ্গাও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। অপার্থিব সেই দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে বহু মাইল হাঁটা যায়। ক্যাম্পের মালিক শান্তা নেগীজি ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করে ফেলেছেন। গিটারটা প্রচণ্ড মিস করছিলাম। গাইতে বা বাজাতে না জানলেও শ্রোতা হিসাবে আমার বেশ নামডাক। কুছপরোয়া নেই, কাকিমাই উদ্যোগী হয়ে শুরু করে দিলেন অন্ত্যাক্ষরী। একে একে সবাই তাতে যোগ দিয়ে গলা মেলালাম। জিনিয়া আর সোহিনীর রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন জমাটি হতে শুরু করেছে তখনই ডাক পড়ল ডিনারের। ঘড়ির কাঁটা নটা ছুঁয়েছে। ডাইনিং রুমে গিয়ে 'সাঙ্গা'র দেখা পেলাম। শান্তাজীর পোষ্য সারমেয়। জাতে কুলীন ম্যাস্টিফ। আকারে প্রকাণ্ড কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে নেহাতই গোবেচারা। নিতান্তই নিষ্পাপ। খাওয়ার আয়োজন মন্দ নয়, ভাত, রুটি, ডাল ফ্রাই, মিক্স ভেজ, চিকেন কারি আর শেষপাতে ফ্রুট কাস্টার্ড। বাঙ্গালির মান রাখতে ঐ শীতেও ভাতটা খেলাম। আর চিকেনটা এক কথায় অসাধারণ। খোঁজ নিয়ে জানলাম রাঁধুনি আর কেয়ারটেকার ভদ্রলোক আমাদের বঙ্গদেশের। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ডাইনিং রুমের অধিকাংশ অতিথিই বাঙালি। ডিনার করে বাইরে দাঁড়াতে ঠাণ্ডাটা দাঁত, নখ বের করে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে যে যার টেন্টে ঢুকলাম। খানিক বাদে ক্যাম্পের অল ইন অল, দেবাশিসদা প্রত্যেকের জন্য গরম জলের ব্যাগ নিয়ে হাজির। বলল কোনো চিন্তা নেই, দরকার হলে আরও ব্যাগ পাওয়া যাবে। যাই হোক দুটো কম্বল নেওয়ার পর,একটা করে হট ওয়াটার ব্যাগেই ঠাণ্ডাটা বাগে এসে গেল।

পপলার,উইলোর হলুদ পাতার জলছবি - নাকো লেক

গোলাপি আলো ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব পরদিন সকালে যথাসময়ে হাজির। ঝকঝকে নীল আকাশে ধ্যানমগ্ন তুষারশুভ্র হিমালয়ের রঙবদল গোটা উপত্যকাকে মায়াবী করে তুলল। আগের দিন বিকালে নাকোর স্নিগ্ধ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু সকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন উপত্যকার মাঝে লেকের শান্ত নীল জলে হিমালয়ের পপলার, উইলোর হলুদ পাতার প্রতিবিম্ব পৃথিবী সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে নরম সূর্যের আলোয় তারিয়ে তারিয়ে সকাল হওয়াটা উপভোগ করলাম। আড়মোড়া ভেঙে ছোট্ট গ্রামটা জাগছে। বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে করেই ক্যামেরা নিলাম না। মনের ক্যামেরায় বন্দী করব বলে। আমি সাহিত্যিক নই, কিন্তু হিমালয়ের এক স্বল্পখ্যাত ছোট জনপদের সেই সকাল আজ কলম ধরতে বাধ্য করল। জানি না ক্যামেরা না নেওয়ার ক্ষতিটা এই লেখা দিয়ে উসুল করতে পারব কিনা।

ক্যাম্পে যখন ফিরলাম তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। বাকিরাও ফ্রেশ হয়ে রেডি। আরেক রাউন্ড চা শেষ করে গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেড, বাটার, জ্যাম, টোস্ট, অমলেট ইত্যাদি ছাড়াও একটা করে আলু পরোটা গলাধঃকরণ করা হল। এরপর ফ্রুট স্যালাড দিয়ে তখনকার মতো প্রাতরাশের যবনিকা টানা হল। এরপর ক্যাম্পের গা বেয়ে মেঠো পথ দিয়ে নেমে গেলাম লেকের কিনারে। ইতঃস্তত, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো। কখনও গ্রামের পথে। সরু পাথুরে রাস্তায়। শহুরে থ্রি জি, ফোর জি ইন্টারনেট দৌড়ের থেকে অনেকদূরে। আরেক দিকশূন্যপুরে।

ট্রেকিং-এ আগ্রহীরা ক্যাম্প থেকে ঘুরে আসতে পারেন তাশিগাং, সমাং মনাস্ট্রি, নাকো ফলস, নাকো পাস। এছাড়াও আছে কাছাকাছি গ্রামগুলো যেমন লিও, চাঙ্গি, ইয়াংথাং। ট্রেকিং-এর যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেন ক্যাম্পের মালিক শান্তা নেগী। হাঁটাপথে ঘুরে নিলাম নাকো মনাস্ট্রি, পদ্মসম্ভবের পদচিহ্ন। এখানে বলে রাখি, নাকো খুব ছোট জায়গা, তাই আগে থেকে বুকিং না করে গেলে অসুবিধায় পড়তে পারেন। মোবাইলেরর টাওয়ার বিএসএনল ছাড়া পাবেন না।

সাংলা - ছিটকুল

নাকোর পাট চুকিয়ে রওনা হলাম সাংলার দিকে। নাকো থেকে দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। সময় লাগবে সাড়ে চার ঘণ্টা। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফেরত চললাম। ব্রেকফাস্ট করে ফেরার পথ ধরলাম। স্পিতি ভ্যালির সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। ৫০৫ নং জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে ইয়াংথাং গ্রামের রোড কাট থেকে এগিয়ে দেখি বিধি বাম। রাস্তা চওড়া করার জন্য ডিনামাইট ব্লাস্টিং করা হচ্ছে। অগত্যা এক ঘণ্টার অপেক্ষা। কিছু পরে জানা গেলো ব্লাস্টিং এর ফলে পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল এক পেল্লায় পাথর রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে। ছোট বড় পাথরের টুকরো তখনও পড়ে চলেছে। আমাদের গাড়ি থেকে দূরত্ব মেরেকেটে ২০০ মিটার। ধ্বসের বহর দেখে বুঝলাম গতিক বিশেষ সুবিধের নয়। গাড়িতে ফিরে দেখলাম। পিছনে লম্বা লাইন, ফেরার পথও বন্ধ। উপায়ান্তর না দেখে গাড়িতেই বসতে হল। যাইহোক আরও তিন বার ব্লাস্টিং-এর পর পে লোডার দিয়ে রাস্তা সাফ করে যান চলাচলের যোগ্য করতে করতে ছ ঘণ্টা কেটে গেল। সেও এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। রাস্তা খুলে দেওয়ার পর যখন ধ্বসপ্রবণ জায়গাটা অতিক্রম করছি, তখনও গাড়ির ছাদে টুপটাপ পাথর ঝরে পড়ছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি বিপজ্জনকভাবে বেশ কিছুটা অংশ ঝুলে রয়েছে। ছ-সাত ঘণ্টা রাস্তায় অকারণ নষ্ট হওয়ায় শিডিউল কাটছাঁট করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

রেকং পেও যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সাতটা বাজে। অন্ধকার নেমে এসেছে। এখনও দেড় ঘণ্টার রাস্তা। আরও এগিয়ে কারছাম-এ বাঁধের কাছে শতদ্রুর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে বাম দিকে সাংলা-ছিটকুল রোড ধরলাম। শুরু হয়ে গেল সাংলা ভ্যালি। হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট এর চৌহদ্দি পেরনোর পর রাস্তা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুটা এগিয়ে বাসপা নদীকে ডানদিকে রেখে গাড়ি চলতে লাগল। পাশে অন্ধকার পাহাড়ের পাশ দিয়ে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক বানভাসি। পিছনের পাহাড়ে রেকং পেও শহরটা আলোর মালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব ইচ্ছে করছিল গাড়ি দাঁড় করিয়ে জ্যোৎস্না দেখার কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সে আশায় জল ঢেলে দিলো। সাংলা যখন পৌঁছলাম রাত তখন নটা। ঠাণ্ডা নাকোর থেকে বেশ কম। উপভোগ্য। সারাদিনের ধকলের পর কোনোরকমে ডিনার সেরে শরীরটা নরম বিছানায় এলিয়ে দিতেই তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে। ফ্রেশ হয়ে জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে বেরলাম। সকালের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। বাসস্ট্যান্ডে লোকজন আসতে শুরু করেছে। চারদিক পাহাড়ঘেরা ছোট শহর সাংলা, পাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে বাসপা নদী। তিব্বত বর্ডার খুব কাছে হওয়ায় ১৯৮৯ সাল অবধি এখানে আসতে ভারতীয়দের ইনার লাইন পারমিট নিতে হত। এখন অবশ্য সেই ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়না।

সাংলা ভ্যালি, পাশে বয়ে চলেছে বাসপা নদী

সকালে আলুর পরোটা, আচার, দই সহযোগে ব্রেকফাস্ট সারলাম। সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা গরমাগরম চা। চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাসপা। খরস্রোতা নদীর কুলকুল শব্দে নিস্তব্ধ উপত্যকা মুখরিত। কাছেই ঢঙ ঢঙ শব্দে ঘণ্টা বাজল। কানে

ভেসে এল স্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীত। এগিয়ে গিয়ে স্কুলটাও দেখা গেলো। ইউনিফর্মপরা এক ঝাঁক কচিকাঁচা। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে প্রার্থনাপর্ব শেষ হতেই লাল সোয়েটারপরা খুদের দল গুটিগুটি ক্লাসে ঢুকে গেল। আর সারাদিনের জন্য মনের সুরটা বেঁধে দিয়ে গেল। জলযোগ শেষ করে আবার যাত্রা শুরু। গন্তব্য ছিটকুল। প্রাচীন ভারত-তিব্বত বাণিজ্য সরণীর সীমান্ত গ্রাম। সাংলা থেকে দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে ঘন্টাখানেক। সরকারি বাসও পাওয়া যায়।

সাংলা থেকে দেখে নিতে পারেন সাংলা মনাস্ট্রি, কাম্রু দুর্গ (হিমাচল প্রদেশের অন্যতম প্রাচীন দুর্গ), বেরিং নাগ টেম্পল, বাতসেরি ভিলেজ এবং ছিটকুল।

সাংলা ভ্যালি প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ। উঁচু উঁচু পাইন, সিডার এর জঙ্গল চিরে কুলকুল করে বয়ে চলেছে বাসপা। পাহাড়ের মাথা বরফের টুপি পরে দাঁড়িয়ে। উদ্দাম স্বচ্ছ জলরাশি ছোট বড় বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে উপত্যকা জুড়ে এক সঙ্গীত মূর্ছনার সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি এখানে কবিতার মতো। ঝরঝরে। স্বপ্নিল। ছিটকুল, রাকছাম, বাতসেরি, থেমগারাং, কাম্রু আর সাপ্নি গ্রাম নিয়ে সাংলা ভ্যালি। অধিবাসীরা সবাই কিন্নরী। উপত্যকা জুড়ে আপেল, গোল্ডেন আপেল, অ্যাপ্রিকট, ওয়ালনাটের বাগান। হিমবাহের বরফগলা জলে পুষ্ট উপত্যকা জুড়ে শুধু সবুজের সমারোহ। সাংলা বাস স্ট্যান্ড পেরিয়ে ব্রিজ পার হতেই, মাইলস্টোন জানান দিল সাংলা জিরো কিলোমিটার। ব্রিজ পেরোতে সামান্য যে শহুরে কংক্রিটের জঙ্গল ছিল তা কমতে শুরু করল। আশপাশের বাড়িঘরে গ্রাম্য স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। চলতে চলতে রাস্তার বাম দিকে বনিং শেরিং, শেরিং চে এর মতো ছোট ছোট গ্রাম পেলাম। তারপরে এলো বাতসেরি। এখানে দেখে নিতে পারেন বদ্রিনারায়ণ টেম্পল। এরপর এলো তুলনামূলক বর্ধিষ্ণু গ্রাম রাকছাম। গোটাদুই ছিমছাম হোটেলও চোখে পড়ল।

. শেষ সীমান্ত গ্রাম, ছিতকুল থেকে সাংলা ভ্যালি

রাকছামের পর প্রকৃতি আরও অকৃপণ। পাহাড়চূড়াগুলো আরও কাছে, আরও শুভ্র। হিমবাহগলা জল ছোট, বড় ঝরনা বা প্রবাহ হয়ে মিশেছে মূল নদীতে। উপত্যকায় কিছু দূরে দূরে বেশ কয়েকটা নেচার ক্যাম্প, ভ্রমণবিলাসীদের জন্য। ছিটকুল-এর সামান্য আগে চোখে পড়ল, এক বাঙালি হোটেল শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ছিটকুল ঢোকার মুখে লোহার কাঠামোর তৈরি গেট জানিয়ে দিল ইন্দো-টিবেট বর্ডারের শেষ গ্রামে এসে গেছি। এখানেও বাঙালিদের সদম্ভ উপস্থিতি। কোনও এক 'গোপাল দা'-কে তার বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করছেন। ছিটকুল এর বিশেষত্ব কোনও এক ব্লগে সুন্দর লেখা আছে। ব্লগার এর নামটা মনে না পড়ায় এখানে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যার মূল বক্তব্য ছিল 'ছিটকুল সম্পর্কে কোন ধারণা তার ছবি দেখে উপলব্ধি করতে পারবেন না, কারণ যত ভালই ক্যামেরা হোক, ছিটকুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে অপারগ।' মনে মনে ব্লগার কে কুর্নিশ জানালাম। কাঠের কারুকাজ করা পাহাড়ি বাড়িঘর, দিগন্ত প্রসারিত নী-লা রেঞ্জ, কাগুপা টেম্পল প্রাপ্তির ভাঁড়ার কানায় কানায় পূর্ণ করে দিলো। ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে যান বাসপা নদীখাতে। চঞ্চলা নদীর কাঁচের মতো টলটলে জলে পা ভিজিয়ে নিন। সামনে আদিগন্ত ঘাস জমিতে চরে বেড়াচ্ছে গবাদি পশুর দল। বাতাস কানে কানে যেন ফিসফিস করে বলে যাচ্ছে 'ওম মণি পদ্মে হুম।'

দুপুরের খাওয়াটা ছিটকুলেই করা হবে ঠিক হল। বাঙালি হোটেল দেখে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা চিন্তা করাও অস্বাভাবিক। মেনু খুব সিম্পল। ভাত, ডাল, আলুপোস্ত আর ডিমের ঝোল। রান্নাও আহামরি নয়। কিন্তু প্রবাসীর কাছে তাই অমৃত। খাওয়া শেষ করে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে আপেলবাগানে ঢুঁ মারলাম। সাংলা বাজারে নেমে সামান্য কেনাকাটা সেরে হোটেলের পথ ধরলাম। ভোজনবিলাসীরা এখানে ট্রাউট মাছের ফ্রাই ট্রাই করতে পারেন। যদিও সুস্থতার গ্যারান্টিটা নিজেকেই নিতে হবে।

সারাহান

সাংলা পর্ব সাঙ্গ করে আবার পথে নামলাম। সাংলা থেকে সিমলার দূরত্ব ২৪০ কিলোমিটার। আমাদের গন্তব্য সিমলা হলেও ৯০ কিলোমিটার গিয়ে জিয়োরি থেকে সারাহান হয়ে ফিরব। জিয়োরি থেকে সারাহান ১২ কিলোমিটার। সাংলা - ছিটকুল রোড ধরে সাংলা থেকে কারছাম পর্যন্ত এলাম। কারছাম থেকে ৫নং জাতীয় সড়ক ধরে টাপরি, ওয়াংটু, শুরু হয়ে পৌঁছাতে হয় জিয়োরি। জিয়োরি বাজারের আগেই বাম দিকে একটা রাস্তা পড়বে যেটা আপনাকে শর্টকাটে সারাহান পৌঁছে দিলেও, রাস্তার অবস্থা কহতব্য নয়। সুতরাং জিয়োরি পৌঁছে জিয়োরি-সারাহান রোড ধরাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ভীমাকালী মন্দির, সারাহান

হিমাচলের বাকি গ্রামের মতই সারাহানও সুন্দর এবং ছিমছাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২,৩১৩ মিটার। পাইন, ওক, দেবদারুর জঙ্গলে মোড়া, প্রাচীন বুশহর রাজবংশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ভীমাকালী মন্দির সারাহানের মুখ্য আকর্ষণ। দেবী এখানে রাজবংশের কূলদেবী হিসাবে পূজিতা। কথিত আছে দক্ষযজ্ঞের সময় সতীর কান এখানে পড়েছিল। মন্দিরের অপরূপ গঠনশৈলী শতাব্দীপ্রাচীন ইন্দো-টিবেট সংস্কৃতির মৈত্র্য-এর সাক্ষ্য বহন করে। মন্দিরের কাঠের কারুকার্য, রুপোয় মোড়া প্রবেশদ্বার মনোমুগ্ধকর। পাশাপাশি দুটি মন্দির, একটি নতুন ও আরেকটি আটশো বছরের পুরনো। পুরনো গর্ভগৃহে অবশ্য সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। ধর্মবিশ্বাস প্রবল না হলেও, সারাহান পৌঁছে মন্দির দর্শনের লোভ সামলাতে পারলাম না। কাকিমা আমাদের হয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে দিলেন। পুজোপর্ব সাঙ্গ করে মন্দিরের সামনের মেলায় গেলাম। গরম গরম জিলিপি দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ঠোঙা ভর্তি জিলিপি নিমেষে সাবাড়। প্রথমে ঠিক ছিল ফেরার পথে নারকান্ডায় দুপুরের খাওয়া সারা হবে। কিন্তু মন্দির থেকে গাড়িতে ফেরার সময় নাকে এলো বাঙালি রান্নার গন্ধ। জিনিয়া বলল অবশ্যই মাছের ঝোল বানাচ্ছে। জিনিয়ার ওপর ভরসা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম গন্ধের উৎসসন্ধানে। বেশিদূর যেতে হল না। রাস্তার পাশেই বাংলা হরফে বড় করে লেখা। অমায়িক ম্যানেজার বাঙালি দেখে চটজলদি বন্দোবস্ত করে দিলেন। ভাত, ডাল, আলুপোস্ত আর ধোঁয়াওঠা চিকেনের ঝোল দিয়ে রাজকীয়ভাবে লাঞ্চ সারলাম। তারপর আবার পথচলা।

সিমলা

হিমাচল প্রদেশের রাজধানী, আর ভারতবর্ষের ব্রিটিশ আমলের শৈলশহর সিমলা আমাদের শেষ গন্তব্য। সিমলা অন্যতম প্রাচীন শৈলশহর হওয়ায় আর নতুন করে বলার কিছু নেই। দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যাল রোড, চার্চ, টাউন হল, পাবলিক লাইব্রেরি, মিউজিয়াম। দেখে নিন কালকা-সিমলা ন্যারোগেজ ট্রেন। ঘুরে আসতে পারেন ঝাকু হিল। হোটেল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরের বন্দোবস্ত করে দেয়। রিজ, লোয়ার বাজার, লক্কড় বাজার কেনাকাটার জন্য আদর্শ। হোটেল থেকে ফ্রেশ হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। যদিও সাড়ে নটা বেজে গেছে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে লিফটে করে পৌঁছালাম ম্যাল রোডে। সকালের হলুদ রোদ তখনও ঠাণ্ডা পুরো কাটাতে পারেনি। দোকানিরা সদ্য দোকান খুলছে। ম্যাল রোডে মর্নিং ওয়াকারদের ভিড়। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম টাউন হলের সামনে। যাব 'ওয়েক এন্ড বেক কাফে' তে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ক্যাফেতে পৌঁছালাম। পছন্দসই টেবিল পেয়ে অর্ডার দেওয়া হল। স্মাশড পোটাটো, স্ক্রাম্বল্ড এগ, সসেজ, ব্রেড দিয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। সঙ্গে ক্রেপস, ওয়াফেল এবং অ্যাপল পাই। শেষে হ্যাজেল নাট লাতে। ব্রাঞ্চ দিয়ে সকাল শুরু করার পর ম্যাল রোডের বেঞ্চে বসে আয়েশ করে নিউজপেপারে চোখ বোলালাম। বাকিরা ততোক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শপিং-এ। সিমলা একাধিকবার ঘোরা হওয়ায় ঝাকু হিল, গলফ কোর্স ইত্যাদির জন্য কারো বিশেষ হেলদোল দেখা গেলো না।

টাউন হল, সিমলা

ক্যামেরা হাতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর পর আবার ক্লান্ত হয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে পড়লাম। খানিক পরে বাকিরা কয়েকটা ঢাউস ব্যাগ নিয়ে হাজির। চললাম সিমলা কালীবাড়ি দর্শনে। ম্যাল রোড থেকে এগিয়ে বিএসএনএল-এর অফিস ফেলে রেখে এগোতেই চোখে পড়ল ভগ্নপ্রায় এক ব্রিটিশ বাংলো, 'শার্লেভিল ম্যানসন।' বেশ একটা গা-ছমছমে ব্যাপার। ক্যামেরাবন্দী করার সুযোগ হাতছাড়া করার কোন মানে হয় না। গেটের বোর্ড থেকে জানা গেল এখন জনৈক ভদ্রলোকের সম্পত্তি, সঙ্গে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ। কালীমন্দির দর্শন করে ফেরার পথ ধরলাম। পরিত্যক্ত বাংলোর গায়ে তখন বিকেলের রোদ। বাংলোর কাঁচের জানালায় একটা ছায়ামূর্তি থাকলে ভূতবাংলোর তকমা দেওয়া যেত। এইসব হাসিমস্করায় বাকি পথটা কেটে গেলো। টাউন হলের রাস্তা ধরে নিচের দিকে নেমে খাদি ভবনের সামনে 'হানি হাট'-এ মধু দিয়ে চা খেয়ে বিকালের চা-পর্ব শেষ করলাম। এবার হোটেলে ফেরার পালা। হোটেলে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত চলল ভূতের গল্প। পরদিন সকালে রওনা হয়ে গেলাম চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিয়ে চললাম অসংখ্য টুকরো টুকরো স্মৃতির কোলাজ। আগামীদিনের পাথেয়।

পুনশ্চঃ - চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টে ফ্রি ওয়াই ফাই-এর সদ্ব্যবহার করছিলাম। কৌতূহলবশত সার্চ করলাম 'হন্টেড হাউস ইন সিমলা।' সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্ক্রিনে ভেসে উঠল 'শার্লেভিল ম্যানসন'। তার উল্লেখ নাকি রুডইয়ার্ড কিপলিং এর লেখাতেও পাওয়া যায়।

শার্লেভিল ম্যানসন, সিমলা

~ *কিন্নরের তথ্য* ~ *কিন্নরের আরও ছবি* ~

পেশায় জিওলজিস্ট সুদীপ্ত ঘোষ বর্তমানে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-এর জয়পুর অফিসে কর্মরত। কাজের জন্য বছরে ছয় মাস পাহাড়ে, জঙ্গলে। ফিল্ডে অবসর সময় কাটে বই পড়ে। ক্রাইম থ্রিলার আর ভ্রমণ কাহিনি বিশেষ পছন্দ। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখাও পছন্দের তালিকায় নতুন সংযোজন। ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। পাহাড় আর জঙ্গল দুইই বিশেষ প্রিয়। এছাড়া বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া অন্যতম পছন্দের কাজ। লেখালিখির অল্পবিস্তর চর্চা থাকলেও কোন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠানোর দুঃসাহস আগে হয়নি।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

রাজ কাহিনি

তপন পাল

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

রাজস্থানের তথ্য ~ *রাজস্থানের আরও ছবি*

তৃতীয় দিন -
সকালের জলখাবার খেয়ে পথে। জয়পুর শহর গড়ে তোলেন মহারাজা সওয়াই জয় সিং (০৩-১১-১৬৮৮ থেকে ২১-০৯-১৭৪৩)। মাত্র এগার বছর বয়সে পিতা মহারাজা বিষণ সিঙের মৃত্যুর পর মহারাজা হওয়া এই মানুষটি আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সওয়াই,অর্থাৎ অপরাপর বাড়ির লোকজনেদের চেয়ে এক চতুর্থাংশ বেশি,উপাধি পান। ১৭০৭এ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ তাকে আরও অনেক উপাধি টুপাধি দিয়েছিলেন। দিল্লি আগ্রা জয়পুর নিয়ে ভারতের পর্যটন মানচিত্রের সোনালি ত্রিভুজ। তার তৃতীয় কোণ জয়পুর দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০০ কি.মি.দূরে,আগ্রা থেকে পশ্চিমে ২০০ কি.মি. দূরে। শহরের তিনদিকে আরাবল্লী পর্বতমালা, দুর্গ আর মিনার। পুরো শহর জুড়ে গোলাপী রং; যেন গোলাপের উৎসব; রোজই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে। রাজা দ্বিতীয় রামসিং গোলাপী রং ভালবাসতেন, তাই জয়পুর পিঙ্ক সিটি। নামটা বজায় রাখতে এরা মরিয়া; বাধ্যতামূলকভাবে সব বাড়ির রং গোলাপী। তবে শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন শুধু শহরের কেন্দ্রীয় অংশই গোলাপি। শহরটি বেশ ছড়ানো - অনেক ফাঁকা জায়গা এখানে ওখানে; গাছ গাছালি, তাতে বিকালে জল দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, সরকারি অফিস ভবন... স্থাপত্য অতীব মনোরম; চোখের আনন্দ।

সিটি প্যালেস অষ্টাদশ শতকে অম্বরের কচ্ছওয়াড়া রাজপুত রাজা মহারাজা দ্বিতীয় জয় সিংহের নির্মাণ। মার্বেলের কারুকার্য, স্তম্ভ, জালি বা জাফরি কাজ খচিত অভ্যন্তর। জালেব চক্ ও ত্রিপোলিয়া গেট এই প্রাসাদের প্রবেশপথ। জয়পুরের বর্তমান (আনঅফিশিয়াল) রাজামশাই, কুড়ি বছর বয়স্ক সওয়াই পদ্মনাভ সিং আপাতত বিদেশে; প্রাসাদে থাকেন তাঁর মাতা, বর্তমানে এম.এল.এ. দিয়া কুমারী - জয়পুরের শেষ (অফিশিয়াল) মহারাজা ব্রিগেডিয়ার সওয়াই ভবানী সিংয়ের (১৯৩১ - ২০১১) একমাত্র সন্তান ও তদীয় মাতা পদ্মিনী দেবী। প্রসঙ্গত রাজকুমারী দিয়া কুমারী নব্বইয়ের দশকে তাঁদের পারিবারিক ট্রাস্টের হিসাবরক্ষককে বাড়ির অমতে গোপনে বিবাহ করে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। প্রাসাদশীর্ষে আজও জয়পুর স্টেটের পতাকা উড্ডীন। স্থাপত্যে মুঘল, রাজপুত এবং ইউরোপীয় ছাপ। বিশেষ আকর্ষণ রুপোর তৈরি গঙ্গাজলি, গঙ্গাজল রাখার দৈত্যাকার পাত্র। মহারাজা দ্বিতীয় মধু সিংহ এগুলি তৈরি করান যাতে সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় তিনি স্নানের জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যেতে পারেন।

হাওয়া মহল রাজ পরিবারের মহিলাদের জন্য; সম্ভবত মুসলমানদের দেখাদেখি, রাজপুতরাও মহিলাদের জন্য কঠোর পর্দাপ্রথা চালু করেছিলেন। আটতলা প্রাসাদটিতে জানলা আছে প্রায় ন'শো! মরুভূমির দেশে হুহু করে হাওয়া বয়, সঙ্গে মহিলাদের ঘরে বসে বাইরের জগত দেখার সুযোগ। ১৭৯৯ সালে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং দ্বারা নির্মিত।

অ্যালবার্ট হল্ যাদুঘর জয়পুরে রামনিবাস বাগানের অভ্যন্তরে, লন্ডনের আলবার্ট যাদুঘরের আদলে নির্মিত। রান্নার বাসনপত্র, গানবাজনার সরঞ্জাম, সাজগোজের জিনিস থেকে শুরু করে অস্ত্রশস্ত্র, পোষাকপরিচ্ছদ সবই সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে এখানে। আম্বের (আমের) দুর্গ জয়পুর শহর থেকে জলমহল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে এগারও কিলোমিটার গিয়ে একটি টিলার মাথায়। সাদা মার্বেল আর লালপাথরে মুঘল ও রাজপুত স্থাপত্যের যুগলবন্দী, রাজা মান সিং-এর তৈরি। রাজস্থানের কেল্লাগুলি নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ের ওপরে তৈরি; প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর। নামার আগে সারথি মহোদয় বললেন গাইড বলবে বাইশটি দর্শনীয় স্পট, কিন্তু আসলে চারটি - গণেশ পোল (পোল = দরজা), শিশ মহল, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস। আর এগুলো দেখার জন্য গাইড নেওয়ার কোনওই মানে হয় না কারণ সবজায়গাতেই বোর্ডে ইতিহাস প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত।

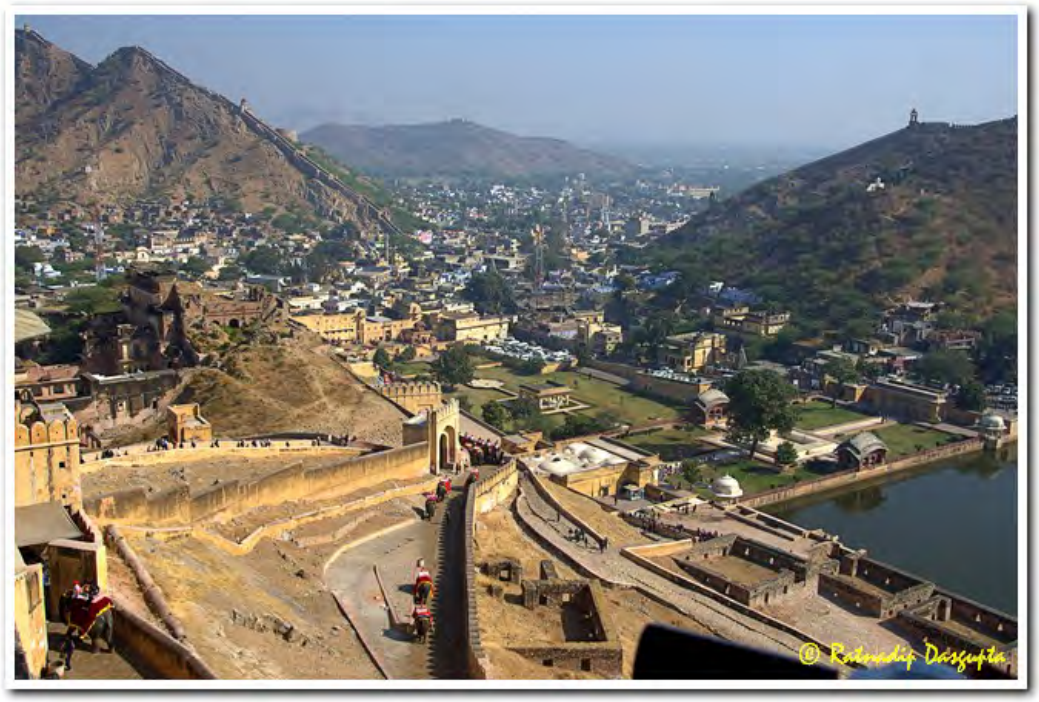

মান সিং ছিলেন সম্রাট আকবরের বিশ্বস্ত, তাঁর নবরত্ন সভার একজন, এবং খুব সম্ভবত যোধাবাঈ তাঁর পিসি। নিম্নবর্গীয়রা চিরকালই উচ্চবর্গীয়দের অনুকরণ করে; তাই মান সিং কেল্লার মধ্যে মুঘলদের আদলে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস তৈরি করাবেন এটাই স্বাভাবিক। বাংলার বারোভুঁইয়ার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত অনুচর কমলখোজা ইছামতী নদীর তীরে জ্যোতি দেখতে পান। তিনি মহারাজাকে জানালে প্রতাপাদিত্য সেই বাদাবন পরিষ্কার করে দেবীর অঙ্গশিলা প্রাপ্ত হন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোবৃদ্ধি ঘটে, তিনি উৎকল আক্রমণ করে উৎকলেশ্বর শিব ও গোবিন্দ মূর্তি হরণ করে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে আকবরের শাসনকালে রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করে দেবী সতীর অঙ্গশিলা জয়পুরে নিয়ে আসেন। তদবধি দেবী যশোরেশ্বরী এই দুর্গে আসীনা। ভোরবেলায় বলি দিয়ে পূজা শুরু হয়। দেবীপূজার ভার বারোভুঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের পুরোহিত মহেশানন্দ ভট্টাচার্য্যের বংশধরদের হাতে।

শিশমহল বিভিন্ন আকারের ছোট বড়ো আয়না দিয়ে তৈরি। কেল্লার ওপর থেকে দেখা যায় পাশের মাওতা লেক; হ্রদের মাঝখানে চমৎকার উদ্যান। দূরে দেখা যায় পাহাড়, সেইসঙ্গে ফোর্টের পাঁচিল। সূর্যাস্তকালে কেল্লার হলুদ-কমলা পাথরে দিনমণির শেষ আভা অতীব মনোরম।

আমের দুর্গে বংশপরম্পরায় রাজপরিবারের যে সকল পেশাভিত্তিক কর্মচারীরা কাজ করতেন, তাঁরা এখন দুর্গের বাইরে পাহাড়ের কোলে গ্রামে থিতু হয়েছেন। তাঁদের দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা হতেই - তাঁদের এক সমবায় সমিতিতে হাজির। সেখানে প্রাকৃতিক রঙে হাতে কাপড় রাঙানো হচ্ছে, দামি ও স্বল্পদামী পাথর কাটা হচ্ছে; সে এক হইহই রইরই কাণ্ড। বিক্রি হচ্ছে রাজস্থানী রেজাই (কাঁথা সদৃশ), কুর্তা, মূর্তি, শাড়ি, চুড়িদার, স্মারক, উপহার সামগ্রী। পণ্য বিক্রির সময় পণ্যের আধিভৌতিক গুণাবলীর সঙ্গে এনারা আধিদৈবিক কিছু গুণাবলী যোগ করে দেন; যথা ঘরে দুমুখো গণেশমূর্তি রাখলে ধনসম্পদ দ্বিগুণ হবে, উটের চামড়ার জুতো পরলে পায়ের কড়া বা গোড়ালির ব্যথা বশে থাকবে, পিতলের কাটা প্রদীপ বাড়ির নৈর্ঋত কোণে রাখলে বাড়ীতে কারও সংক্রামক রোগ হবে না, পশমিনা রেজাই গায়ে দিয়ে ঘুমোলে স্নায়বিক ও অস্থিসম্পর্কিত আধিব্যাধি পালাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে পেশ করা হল এক জ্যোতিষীসমীপে; তাঁরা বংশপরম্পরায় রাজজ্যোতিষী, অর্থাৎ রাজ পরিবারের জ্যোতিষী, এবং অদ্যাবধি মহারাজার ট্রাস্টের বেতনভুক, তাই তিনি বিনা পয়সায় কোষ্ঠী বিচার করেন ও হাত দেখেন। লোকটিকে দেখে ভক্তি হল, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের দেখে যেমনটি হয়। যেহেতু তাঁর ও আমার মধ্যে কোন আর্থিক সম্পর্ক নেই, আশা করা যায় তিনি সত্যই বলবেন; তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন!

এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে লোকটির প্রতিটি কথা মিলে গেল! আমার ও শ্রীমতী পালের পেশা, পেশাগত সমস্যা, আধিব্যাধি, সন্তানসন্ততি, তাদের শিক্ষা, কর্মজীবন, আমাদের বর্তমান উদ্বেগের কারণ, এমনকি শ্রীমতী পালের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অতীত ওঠাপড়া সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, শুনে আমি চিত্তির। কলকাতা হলে ভাবতাম লোকটি বুঝি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী! তাঁকে টাকা দিতে গেলাম; নিলেন না। বললেন দেহের সমওজনের সরষের তেল দীপাবলিতে গরিব দুঃখীর মধ্যে দান করে দিও। শুনে আমি হতবাক! তিয়াত্তর কিলো সরষের তেলের বর্তমান বাজারদর তো প্রায় দশ হাজার টাকা। পাবো কোথায়? আর অত তেল বিলি বন্দোবস্ত করার মত অত গরিব দুঃখীই বা পাবো কোথায়! সরকার বাহাদুর একশো দিনের কাজ চালু করার পর গরিব কোথায়?

পর্যটনকে কিভাবে তুলে ধরতে হয়, কিভাবে পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণেশের কর্মসংস্থান করতে হয় - বাঙালির কাছে তার প্রাথমিক উদাহরণ যদি হয় পুরী, তবে মাধ্যমিকতম উদাহরণ নিঃসন্দেহে রাজস্থান। এখানকার জনগণ ভ্রমণার্থীনিবেদিত প্রাণ, তাঁদের জন্য এদের হৃদয়ের দরজা সদা-উন্মুক্ত। যে হোটেলে ছিলাম, বাঙালি বুঝতে পেরে রবিবার সকালের জলখাবারে পাঠালেন ফুলকো নুচি - তাতে টুসকি মারলে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর ধনেপাতা দিয়ে মাখোমাখো করে আলুর দম। আহারে! কতদিন পর নুচি খেলাম! তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া। রাজপথ দিয়ে যাচ্ছি, টোলপ্লাজায় গাড়ির সারি, কোথা থেকে একজন ছুটে এসে টাকা নিয়ে ছাপানো কুপন দিয়ে গাড়ি পার করে দিল - আপ টুরিস্ট হায় সার! সৌরজগত নিয়ে মানুষের ধারণা সতত পরিবর্তনশীল; একসময় ভাবা হত পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্রে, বর্তমানে ভাবা হয় সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে, গ্রহরাজি তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তবে পর্যটক হয়ে রাজস্থানে এলে মনে হয় আমিই সৌরজগতের কেন্দ্রে, সবকিছু আমাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। কোন দোকানদার ছেঁড়াফাটা নোট নিতে ঝামেলা করেন না, খুচরো দিন বলে কেঁদে ককান না, বরং না চাইতেই মশলা চা খাওয়ান। তাঁদের প্রতিভা বিস্ময়কর - সাইবেরিয়ায় আইসক্রিম বা সাহারায় ওয়াটার হিটার যে তাঁরা অবলীলাক্রমে বেচে ফেলতে পারবেন, সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

শিশোদিয়া রানি কি বাগ জয়পুর শহরের সর্ববৃহৎ উদ্যান, তাঁর দ্বিতীয় রানি উদয়পুরের রাজকন্যা শিশোদিয়াকে মহারাজা সওয়াই জয় সিংয়ের (১৬৮৮ - ১৭৪৩) উপহার। রাজকন্যা শিশোদিয়া মৎসগন্ধা সত্যবতীসমা। মহারাজা সওয়াই জয় সিংয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহের শর্তই ছিল অগ্রজ রাজপুত্রদের বঞ্চিত করে তাঁর সন্তানকেই রাজা করতে হবে। তবে তেমনটি হয়নি। মহারাজা সওয়াই জয় সিংয়ের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর পুত্র সওয়াই ঈশ্বরী সিং। সুসজ্জিত উদ্যানটির রক্ষণাবেক্ষণ অতি উত্তম। রাজকার্যের ঝক্কি সামলিয়ে রাজামশাই সময় পেলেই রানিকে নিয়ে চলে আসতেন এই প্রমোদ উদ্যানে। সেইজন্যেই রাজপুত ও মুঘল স্থাপত্যশৈলীর উদ্যানটির দেওয়ালে দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান বিবৃত। দোতলা এক প্রাসাদ। তার বিস্তৃত বারান্দা, যতদুর চোখ যায় বিস্তৃত ভূমিচিত্র।

মোতি দুংরি (মুক্তোর পাহাড়)-এর উপর স্কটিশ ধাঁচের মোতি দুংরি প্রাসাদ, সেখানেই মস্ত কারুকার্যমণ্ডিত মোতি দুংরি গণেশ মন্দির। মেওয়ারের রাজা গরুরগাড়িতে চাপিয়ে গণেশদাদাকে আনছিলেন, সেই গরুরগাড়ি এই পাহাড়ের গোড়ায় এসে থেমে গিয়েছিল, কালক্রমে (১৭৬১) এখানেই

মন্দির। রাজা জয় সিং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য দিল্লী, উজ্জয়িনী, মথুরা, বেনারস ও জয়পুরে পাঁচটি মানমন্দির স্থাপন করেন, তার একটি যন্তর মন্তর। সূর্যের অবস্থান থেকে ঋতু, দিনের সময়, রাশি ইত্যাদি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার নানাবিধ যন্ত্র দেখার জন্য গাইড নিয়েছিলাম; তবে তারপরে দেখলাম জ্যোতির্বিজ্ঞান আমি তাঁর থেকে বেশি বুঝি!

জলমহল মানসাগর নামে এক বিশালকায় হ্রদের মধ্যে এই মহল মহারাজা জয় সিংয়ের নির্মাণ। জলমহলে যাওয়া যায় না,হ্রদের পাড় থেকেই দেখতে হয়। হ্রদের জল অতীব নোংরা - সারা শহরের বর্জ্য মানসাগরে এসে পড়ে।

চতুর্থ দিন

জয়গড়,নাহারগড় আর আম্বের ফোর্ট যাওয়ার রাস্তা অনেকটা একই। রাস্তাটি পাহাড়ি; নিষ্পত্র অরণ্যের বুক চিরে; হনুমান ময়ূরে ভরপুর। সারথি মহোদয় আশ্বস্ত করলেন একবার বর্ষা আসতে দিন। দেখবেন শাখায় পত্রে ওরা পল্লবিত হয়ে উঠবে। দিনটি চমৎকার! মেঘলা, দুর্গের চত্বর থেকে দেখা যাচ্ছে দুরের জয়পুর শহর। দুর্গপ্রাকার থেকে দূরে দেখতে দেখতে চোখে পড়লো চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড় আকারের (৭ সেন্টিমিটার), Brown Rock Chat (Indian Chat: (Cercomela fusca)। শরীরের উপরিভাগ গাঢ় বাদামি, ডানা ও লেজ কালচে বাদামি, পেট হালকা বাদামি, ডাক দ্রুত লয়ের শিস, প্রজাতিটি দুর্লভ না হলেও গাঙ্গেয় অববাহিকায় তার দেখা পাওয়া ভার, মূলত মধ্য ও উত্তর ভারতেই তার বিচরণ। ইনি পাথুরে ডাঙ্গাজমি পছন্দ করেন, জোড়ায় জোড়ায় ঘোরাফেরা করেন, এবং মাটি থেকে পোকামাকড় ধরে খান। ইতোপূর্বে একবার ভাদোদরায় পথিপার্শ্বে এনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। দিগন্তে ধোঁয়ার মত কুয়াশা অত বেলাতেও, তাপমাত্রা ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলকাতায় তখন চল্লিশ। তবু শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলবেন গরমে কেউ রাজস্থান যায়,পাগল ছাড়া! জয়গড় কেল্লা রাজা জয় সিং-এর তৈরি। জয়গড় কেল্লা তৈরি করা হয় আম্বেরের বিকল্প রাজধানী রূপে। কেল্লার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এক মস্ত কামান - নাম 'জয়বাণ' - ওজন ৫০ টনের মতো এবং দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের কিছু বেশি। কেল্লার ভেতরে অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহশালা আর সেইসঙ্গে কবে কোথায় কার সঙ্গে কোন রাজপুত রাজার যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল, তার ফিরিস্তি। আম্বের কেল্লা আর জয়গড় কেল্লা একই রাজপরিবারের সম্পত্তি ছিল।

বর্তমানে জয়গড় কেল্লা রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তিনি টিকিট কেটে দেখার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। জয়গড় কেল্লায় রাজার কর্মচারীরা কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণও করে আবার গাইডও বটে। এরকম একজন আমাদের কেল্লাটা ঘুরিয়ে দেখালেন, এবং আশ্চর্যজনকভাবে টাকা দিতে চাওয়া সত্ত্বেও নিলেন না। গ্রিলের গেট দেওয়া একটা বন্ধ দরজা, তার ওপারে আম্বেরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। জয়গড় দুর্গটি বিশাল - দেড় হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত মনন যতখানি বিশালতা ভাবতে পারে, তার চেয়েও বিশাল। তবে এই বিশালত্ব মুগ্ধ আপ্লুত বিমূঢ় করে না; ক্ষুব্ধ করে। কী বিপুল অপচয়! আমরা তো জানি এই দুর্গনির্মাণ, সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ, গণ্ডা গণ্ডা রানির বিলাসিনী জীবনযাপন - অর্থের উৎস কী ছিল। এই টাকা তো এসেছিল ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিদের হাত মুচড়ে।

জয়গড় থেকে নাহারগড় মিনিট দশেক। চারিদিকে জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড়ি দুর্গে দরজা অবধি গাড়ি যায় এটাই রক্ষে। ছোট কেল্লাটি রাজা জয় সিং-এর সময়ে তৈরি। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজ মহিলারা নিরাপত্তার জন্য নাহারগড় দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাহারগড়ের মাধবেন্দ্র প্রাসাদটি দোতলা, এবং সাতশো ফুট উঁচুতে। রাজা সওয়াই রাম সিং এটি তৈরি করেছিলেন তাঁর নয়জন রানির জন্য; ভেতরে ন'টি একই রকমের মহল। আয়তাকার ফাঁকা জায়গা ঘিরে নির্মাণ, সামনে বরাবর বারান্দা। আয়তক্ষেত্রের এক বাহুতে থাকতেন রাজামশাই; বিপরীত বাহুতে প্রধান রানিমা। দুদিকের দুই লম্বা বাহুতে চারজন চারজন করে আট রানীর বারান্দামুখি মহলগুলি। রাজামশাই যখন রানিদের ঘরে যেতেন তখন সব মহলের দরজা বন্ধ থাকতো। রাজামশাইয়ের যে রানির ঘরে যেতে ইচ্ছে হত সেই রানির ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তেন, অন্য রানিরা জানতেও পারতেন না রাজামশাই আজ কার ঘরে পাত পাড়লেন। ন'টা মহল আলাদা আলাদা করে দেখা যায়, তবে যেহেতু একইরকম তাই আর আগ্রহ জাগেনি। প্রাসাদটি দেয়ালচিত্রে অতিশয় সুসজ্জিত। তবে রাজার মহল এখন রেস্তোঁরা।

জলমহল তিন দিকে পাথরের পাহাড় আর মাঝখানে ছয় কিলোমিটার লম্বা বিশাল নীল জলের হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে জলমহল নির্মাণ করেন মহারাজ প্রতাপ সিং। মহলের তিন দিকে হ্রদের পাশে উঁচু পাহাড়। আরেক দিকে পর্যটকদের জন্য বিনোদনকেন্দ্র; সেখানে নাচ-গানের আয়োজন। সবুজ পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের এই মহল থেকে হ্রদে নামার একাধিক সিঁড়ি।
সাততলা চন্দ্রা মহল ভবনটি জয়পুরের মহারাজার ঘর হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি তলা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি। একেবারে ওপরের তলায় 'মুকুট মহল' বা 'ক্রাউন প্যালেস' প্যাভিলিয়ন।
জলমহলের কাছেই মহারানি কি ছত্রি, রাজ পরিবারের মহিলাদের দাহক্ষেত্র তথা স্মৃতি উদ্যান। ছত্রি শব্দটির অর্থ স্মৃতিস্তম্ভ (cenotaph)। স্মৃতিস্তম্ভের সংস্কৃতিটিও রাজপুতরা সম্ভবত মুঘলদের থেকে নিয়েছিলেন। রাজপরিবারের মহিলাদের স্মৃতিতে অসংখ্য ছত্রি, কিছু শ্বেতপাথরের, কিছু স্থানীয় পাথরের, প্রতিটিই সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত; ছত্রির আকার ও আয়তন স্বাভাবিকভাবেই প্রয়াতা মহিলাটির সামাজিক অবস্থানের দ্যোতক। সংশ্লিষ্ট রানিটি যদি রাজামশাইয়ের আগে পরপারে গিয়ে থাকেন, তাহলেই তার স্মৃতিস্তম্ভে ছাদ থাকবে, নচেৎ তোমার স্মৃতিস্তম্ভ অসমাপ্ত পড়ে থাকবে, রাজামশাই নেই, কে আর উদ্যোগ নেবে তোমার ছত্রি শেষ করতে; রোদে পুড়বে তুমি, বৃষ্টি তোমাকে ভেজাবে।

নাহারগড় দুর্গের কাছেই, নাহারগড় পাহাড়ের পাদদেশে কনক উপত্যকায় মহারাজা সওয়াই জয় সিং (১৬৮৮ - ১৭৪৩) নির্মিত মহীশুরের মূল বৃন্দাবন উদ্যানের আদলে কনক বৃন্দাবন উদ্যান। উদ্যানটির রক্ষণাবেক্ষণ অতি উত্তম। দুর্লভ গাছ গাছালি, প্রচুর পাখ পাখালি, দূরে আরাবল্লি, ঝর্না, ছত্রি, জালি অলঙ্করণ, ভিতরে গোবিন্দদেব আর নটবরদেবের মন্দির।

জয়পুর শহরের উপকণ্ঠে অনেকখানি অরণ্যচেরা পথ পেরিয়ে পাহাড় ঘেরা গোলাপি রঙের অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত গলতাজি মন্দির, প্রচুর বাঁদরের উপস্থিতি ও তাদের উদ্ভাবনী বাঁদরামোর জন্য বান্দর মন্দির নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রঙিন দেওয়াল, বাঁকানো ছাদ আর আলঙ্কারিক স্তম্ভের মন্দিরটি বৈষ্ণব রামানুজপন্থীদের আশ্রম, সারা বিশ্বে তাদের শিষ্যকুল বিস্তৃত, তাই সম্পন্নতা চোখে পড়ে। সত্যযুগে গালব মুনি ষাট হাজার বছর তপস্যার পর রাজপুতানার জলসঙ্কট সমাধানে গোমুখ থেকে মা গঙ্গাকে নাকি এখানে নিয়ে এসেছিলেন, সেই থেকে মা গঙ্গা গলতা কুণ্ডে রয়ে গেছেন, তাই এই কুণ্ডে বছরভর জল থাকে; আরও অনেক কুণ্ড, প্রাকৃতিক ঝরনা মন্দিরপ্রাঙ্গণে। তবে গালব দেবতার বরে অক্ষয় কুমারীত্বের অধিকারিণী যযাতিকন্যা মাধবীকে দিয়ে যে সব কাজকর্ম করিয়েছিলেন, তাতে তার প্রতি ভক্তি রাখা দুষ্কর। শ্রীমতী পাল তো ঢুকতেই চাইছিলেন না। প্রতি কার্তিক পূর্ণিমায় নাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর একসাথে এখানে বেড়াতে আসেন। মন্দিরটির স্থাপত্য দর্শনীয়।

জয়পুরের মহারাজাদের দাহক্ষেত্র তথা স্মৃতি উদ্যান গাইতোড়, অনেক স্মৃতিস্তম্ভ থাকার সুবাদে লোকমুখে গাইতোড় কি ছত্রি। সেই ১৭৩৩ সাল থেকে জয়পুরের কচ্ছওয়াহা মহারাজাদের শেষকৃত্য এখানে হয়ে আসছে, ব্যতিক্রম মহারাজা সওয়াই ঈশ্বরী সিং, তার শেষকৃত্য এখানে না হয়ে হয়েছিল নগর প্রাসাদচত্বরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য কারুকার্যমণ্ডিত ছত্রি, কিছু শ্বেতপাথরের, কিছু লালপাথরের; স্থাপত্যে মুঘল প্রভাব সুস্পষ্ট। ছত্রিগুলিতে ধর্মীয় ও সামাজিক উপাখ্যান বিবৃত, যথা শিকারের দৃশ্য, রাজসভার দৃশ্য, হাতি, ময়ূর, বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, ইত্যাদি। রাজাদের জীবনদর্শনে মৃত্যু তাহলে জীবনের সমাপ্তি নয়, তার পরেও রয়ে যাওয়ার, যারা রইলো নিজেকে তাদের মনে পড়ানোর কী মর্মান্তিক প্রচেষ্টা! প্রাঙ্গণটি তিন ভাগে বিভক্ত, কাছেই পাহাড়ের মাথায় গণেশ মন্দির, আর রাস্তার ওপারে টাইগার ফোর্ট।

পঞ্চম দিন
উড়োজাহাজ ধরতে বিমানবন্দর। আমাদের এবারের যাত্রা ছোট উড়োজাহাজে; আটাত্তর আসনের কিউ ৪০০ বম্বারদিয়ার দ্যাশ আট। ভারতে আশির কম আসনের উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং ফি লাগে না। সাবেকি ধরনের উড়োজাহাজ, দুই ডানায় দুটো পাখা লাগানো; ডানাগুলি বিমানের মূল শরীরের (fuselage) ওপরের দিকে, নচেৎ পাখা মাটিতে ঠেকে যাবে। ২৭০০০ ফুট অবধি উঠতে পারে,তবে সাধারণত পনের থেকে ষোল হাজার ফুট দিয়ে যায়। এক উড়ানে ১১০০ নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ ২০৪০ কিলোমিটার অবধি যেতে পারে। ছোট (১৫০০ মিটারের কম) রানওয়েতেও দিব্যি নামতে উঠতে পারে। এই বছরেরই বারোই মার্চ কাঠমান্ডুতে US-Bangla সংস্থার BS 211 ঢাকা কাঠমান্ডু উড়ানের যে উড়োজাহাজটি ভেঙে পড়েছিল,সেটি ছিল এই গোত্রের। পাখা লাগানো উড়োজাহাজে (Turboprop) শেষ উঠেছি ১৯৬৪তে, International Control Commission (ICC) এর Douglas DC-6এ। ফলে মনে একটু অস্বস্তি ছিলই।

জয়সলমির বিমানবন্দরটি মূলত সামরিক, তার একপাশে সিভিল এনক্লেভ। শহরের দক্ষিণ পূর্বে শহর থেকে সতের কিলোমিটার দূরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। ন'হাজার ফিটের একটিমাত্র রানওয়ে, পর্যটনের অফ সিজনে সারাদিনে একজোড়া মাত্র উড়ান; স্পাইসজেটের এস জি ২৯৮১ তিনটে পঁচিশে জয়পুর ছেড়ে চারটে চল্লিশে জয়সলমির, ফের পাঁচটায় জয়সলমির ছেড়ে জয়পুর ছটা দশে। আমাদের উড়োজাহাজটি বারাণসী থেকে জয়পুর এসে ঝিমোচ্ছিলেন, আমাদের নিয়ে উড়লেন। আকাশ থেকেই চোখে পড়ছিল বালি আর বালি, মধ্যে মধ্যে হাওয়াকল

(windmill)। আমরা সমুদ্রবিলাসী, বালি দেখলেই জল খোঁজা অভ্যাস। এখানে জল নেই, পুরোটাই বালি। নামার সময় ঘুরে বাঁক নিয়ে নামলেন, ভূমিস্পর্শের পর গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি; দেখা গেল সামরিক বিমানবহর ও উপকরণাদি। টার্মিনাল ভবন থেকে শ ছয়েক ফুট দূরে উড়োজাহাজ দাঁড়ালো; আমরা নেমে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম।

ষষ্ঠ দিন

জয়সলমির বাঙালির কাছে অনেকটা লন্ডন বা প্যারিসের মত, একবারও না গিয়ে, শুধু পড়েই পড়েই, শহরটা অনেকখানি চেনা। প্রথম গন্তব্য সোনার কেল্লা। গাইডদাদা বাঙালি বুঝতে পেরে বললেন সত্যজিৎ বাবুকে নমস্কার; তাঁর দৌলতেই করে খাচ্ছি; আমাদের নব্য সারথিটিও দেখলাম ঘাড় নাড়লেন। ১৯৭১-এ 'সোনার কেল্লা' পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত জয়সলমির বাঙালির কাছে ছিল মাচুপিচু বা লা দান্তা, এল মিরাদোর মত। আছে ওই অবধি, ব্যস! আর জানতে চেয়োনা বাপু। তারপর চুয়াত্তরে সিনেমা করার সময় সত্যজিতবাবু প্রামাণ্যভাবে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে যেতে হয়। ফেলুদা তোপসে হাওড়া থেকে তুফান এক্সপ্রেস ধরেছিলেন, প্ল্যাটফর্মের ঘড়িতে তুফান এক্সপ্রেস ছাড়ার সময়টিও নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছিল।

১১৫৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রাওয়াল জয়সল নামের এক ভাট্টি রাজপুত দুর্গটি তৈরি করেন। আলাউদ্দিন খিলজি এক কাফেলার উপর ভাট্টি রাজপুতদের আক্রমণে ক্ষুব্ধ হয়ে নয় বছর দুর্গটি অবরোধ করেন। পরিশেষে পরাজয়, মহিলাদের জহরব্রত, তারপর দুর্গটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল বহুদিন। তারপর ভাট্টি রাজপুতদের একটি গোষ্ঠী দুর্গটি দখল করেন, তাদের উত্তরসূরিরা, সংখ্যায় প্রায় চার হাজার, আজও এই দুর্গে বাস করেন - জয়সলমির কেল্লা তাই 'Living Fort'। এই দুর্গ শিল্পে স্থাপত্যে এমনই অনন্য যে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশীদার। ইংরেজ আমলে জয়সলমির ছিল এক বাণিজ্যিক শহর, তাই শহর ও কেল্লাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ব্যবসায়ীদের অসংখ্য হাভেলি। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জয়সলমিরের সব বাসিন্দা এই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেল্লার ভিতর খানকয়েক জৈন মন্দির। মন্দিরগুলি কিন্তু কেল্লার ভিতর বানানো হয়নি, দুর্গ বানানোরও অনেক বছর আগে মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতাবদলের নানা পর্বে জৈন সম্প্রদায় মহারাজার কাছে আবেদন জানান মন্দিরগুলি কেল্লার ভিতর প্রতিস্থাপন করার জন্য যাতে মুসলমান আগ্রাসনকারীরা এগুলি ধ্বংস করতে না পারে। তদনুযায়ী মন্দিরগুলির প্রতিটি পাথর খুলে নিয়ে আসা হয় কেল্লার ভিতরে এবং সেখানে পুনরায় জোড়া লাগানো হয়। মন্দিরের নকশায় ব্যবহৃত রং সবই পরিবেশবান্ধব, কোন না কোন সবজি থেকে আহরিত; এবং অদ্যাবধি উজ্জ্বল। মন্দিরের ভিতরের জল নিষ্কাশন নালা ছয়টি প্রাণীর সমন্বয়ে, শরীর হাতির, পা খরগোসের, মুখের অর্ধেক কুমীরের - পিছনের অর্ধেকে পারাবত, আর পিঠের উপর ময়ূর। হাতির শক্তি খরগোসের গতি কুমীরের ক্ষিপ্রতা পায়রার আর ময়ূরের প্রখরতা আশ্লিষ্ট এর নিরাপত্তায়।

দুর্গে হাজার চারেক লোকের বাস, প্রায় একটি শহর। স্বতশ্চলশকট, দ্বিচক্রযান, ঘরগেরস্থালি। সবাই নিজের জায়গাটুকু নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে, ফলে দুর্গের ছাদে জলের ট্যাঙ্কি, দেওয়ালে উইন্ডো এসি, ছাদে ডিশ এন্টেনা। ছোটখাট নির্মাণকাজও চলছে এখানে ওখানে - কারণ এটিই সময়, পর্যটনের অফ সিজন। বর্ষা এসে গেলে এই লোকগুলিরই আর নাওয়া খাওয়ার সময় থাকবে না। সব গেরস্থেরই ঘরের সামনে একফালি করে দোকান; চা বিস্কুট থেকে শাড়ি, রেজাই থেকে জামা কাপড়, উটের চামড়ার জুতো থেকে পিতলের গণেশমূর্তি, স্মারক থেকে স্মরণিকা।

জয়সলমির শহরের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ হাভেলি ১৮০৫ সালে গুমনচাঁদ পটওয়া নির্মিত। পটওয়াজির পাঁচ পুত্রের জন্য পৃথকভাবে ছোট ছোট পাঁচটি হলুদ বেলেপাথরের হাভেলির - পটওয়াজি কি হাভেলি, এক সরু গলির শেষে; বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অফিস। টিকিট কেটে ঢুকতে হল, ঢুকে মনে হল না ঢুকলেই ভাল ছিল, রক্ষণাবেক্ষণ মর্মান্তিক। তার মধ্যেই দেওয়ালের কারুকাজ, ঝরোখা ইত্যাদি। প্রচণ্ড গরম, তাপমাত্রা প্রায় চল্লিশ, তেমনি চোখ ঝলসানো রোদ। কিন্তু ভিড় এড়িয়ে রাজস্থান দেখতে হলে এই সময় ছাড়া উপায় কী! তার মধ্যেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইউটিউব খুলে আমি একবার বেহালায় বিঠোফেনের Moonlight Sonata শুনে নিলাম। গরম আর ততটা অসহনীয় মনে হচ্ছিলো না।

নাথমলজি কি হাভেলি তৈরি হয়েছিল জয়সলমিরের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী দিওয়ান মোহতা নাথমলের জন্য। দুই স্থপতি ভাই একইসঙ্গে দুদিক থেকে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, শেষে আর মেলাতে পারেন নি। তাই হাভেলির চেহারায় কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি, তবে হাভেলিটি জব্বর। দেওয়ালে ও স্তম্ভের গায়ে কারুকাজ, ঝরোখা, এখানে ওখানে হাতি, ঘোড়া, বাঘের মুর্তি।

রেলস্টেশনের কাছে সেলিম সিং কি হাভেলি গড়ে উঠেছে সতেরো শতকের একটি ভাঙাচোরা হাভেলির উপর। সেলিম সিং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, তাঁদের পরিবার তখনকার জয়সলমিরের সর্বাপেক্ষা ধনী ও প্রভাবশালী পরিবার। হাভেলির ছাদ ময়ূরাকৃতির, সবমিলিয়ে হাভেলিতে আটতিরিশটি বারান্দা, এবং সামনে থেকে দেখতে হাভেলিটি জাহাজের মত। নাচ ঘরটির নাম মোতি মহল।

বিকাল, বা বলা ভালো দুপুর, সাড়ে পাঁচটায় বেরোনো হল। প্রথম গন্তব্য কুলধারা, শহর ছাড়িয়ে পশ্চিমে রাস্তা, মূলত সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত, পনেরো কিলোমিটার গিয়ে দুশো বছর ধরে পরিত্যক্ত এক গ্রাম। ঘরবাড়ি, পাতকুয়ো, মন্দির, পথ...। সবই আছে; নেই শুধু লোকজন। মরুভূমির এই গ্রামের পত্তন ১২৯১ সালে, যোধপুরের পালি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের হাত ধরে। ১৮২৫ সালের রাখীপূর্ণিমার রাতে রাতারাতি ফাঁকা হয়ে যায় কুলধারা এবং তার লাগোয়া তিরাশিটি গ্রাম; আর তার হাজার দেড়েক মানুষ; ঘর গেরস্থালির সবকিছু যেমনটি তেমনটি ফেলে রেখে। অদ্যাবধি পালি ব্রাহ্মণ পরিবারে রাখীপূর্ণিমা পালিত হয় না। সেই থেকে নানা কাহিনির উদ্ভব। জায়গাটি দেখার ইচ্ছা বহুপুরাতন।

ক্ষুধিত পাষাণ গ্রামটি দেখা হল, পুরো চত্বরে আমি একা, কেউ কোথাও নেই - শুধু দীর্ঘশ্বাসপ্রতিম হাওয়া কান ঘেঁসে বয়ে যায়, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় যুদ্ধবিমান। সূর্যাস্তের পর থাকার অনুমতি মিলল না। রাতে নাকি শোনা যায় আর্ত চিৎকার, তাপমাত্রা কমে যায় হঠাৎ হঠাৎ, সকালে নাকি গাড়ির গায়ে দেখা যায় শিশুদের হাতের ছাপ। এটিকে পর্যটনকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার কাজ চলছে, মরু পর্যটনে আগামী সংযোজন ভূত পর্যটন। ফিরে এসে দেখি সারথি মহোদয় দুটি শীর্ণ ঘিয়েভাজা কুকুরকে জল খাওয়াচ্ছেন। এটি নাকি এখানকার অবশ্যকর্তব্য। গ্রাম থেকে একটি পাথর কুড়িয়েছিলাম, সারথি মহোদয় বললেন 'ফেক দো। ইয়ে কোই ঘর লেনে যানেওয়ালা চিজ হ্যায়?'

ভগ্নমনোরথে মরুভ্রমণে; যার পোশাকি নাম 'ডেজার্ট সাফারি'। শ্রীমতী পাল উটের পিঠে উঠতে রাজি হলেন না, উটের গাড়িতেও নয়। অগত্যা জিপগাড়িতে আমরা দুজন, সে আমাদের মরু অভ্যন্তরে তিরিশ কিলোমিটার নিয়ে যাবে ও সূর্যাস্ত দেখাবে, এমনটাই বোঝাপড়া। মাহিন্দ্র থর জিপ যথেষ্ট শক্তপোক্ত ও মহার্ঘ্য - কিন্তু বালির মধ্য দিয়ে সে এমন নাচতে নাচতে চলল যে কিলোমিটার পাঁচেক গিয়েই শ্রীমতী পাল সারথিকে বললেন 'বাবা তুই ঘর চ। সূর্য আমাদের ওখানেও ডোবে, রোজই ডোবে; তোকে আর তা দেখাতে হবে না'। কিন্তু সারথি শুনবে কেন? সে পয়সা নিয়েছে, তার তো একটা দায়বদ্ধতা আছে। বলল এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা সূর্যাস্ত দেখো, তারপর মুখে আওয়াজ করলো, দিগন্ত থেকে নেমে এল এক বালক উটের পিঠে চেপে। আমরা তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম, বালিতে হাওয়ার স্বাক্ষর দেখলাম - পাশ দিয়ে তিন জিপ ভর্তি কমবয়সি ছেলেপিলে হইহই করে চলে গেল।

সেখান থেকে এক ডেজার্ট পার্কে। সেখানে কিঞ্চিৎ বিনোদনের ব্যবস্থা, ঘণ্টা আড়াই রাজস্থানী নাচগান, তৎপরে নৈশাহার। অনেকখানি ছড়ানো জায়গা, চেয়ার পাতা। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে নাচগান হচ্ছে, তার তিনদিক ঘিরে বসার ব্যবস্থা। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে, তাপমাত্রা একচল্লিশ থেকে সাতাশ, তারারা একে একে জ্বলে উঠল। রাতে আমার দুধ খাওয়া অভ্যাস, এখানে উটের দুধ খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই ব্যবস্থা হল। উটের দুধ রাখা যায় না, গরম করলে কেটে যায় - ফলে দোহনের অনতিবিলম্বেই খাওয়া দস্তুর। খেয়ে ভারি মজা হল, এবং কোন শারীরিক বিপর্যয়ও হয়নি। হোটেলে প্রত্যাবর্তন মধ্যরাত্রের পর।

সপ্তম দিন

ফেরার পালা। আমাদের ফেরার কথা ছিল স্পাইসজেটে দিল্লি হয়ে, কিন্তু জুনের সাত তারিখে স্পাইসজেট কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে জানালেন যে উড়ান সারণি পরিবর্তিত হয়েছে এবং পরিণামে দুটি উড়ানই পরিত্যক্ত হয়েছে। ভাড়ার টাকা তাঁরা ফেরত দিচ্ছেন, কারণ, অন্যতর ব্যবস্থা করতে তাঁরা অপারগ। শুনে আমার মাথায় হাত। ফোন করে গালমন্দ করে (তুই আমার টাকাটা বিনা সুদে তিনমাস আটকে রাখলি কেন?) গায়ের জ্বালা কিছুটা মিটলো।

নতুন করে টিকিট কাটা হল। জয়সলমির থেকে স্পাইসজেট এসজি ২৯৮২; সেই কিউ ৪০০ বম্বারদিয়ার দ্যাশ আট; বিকেল পাঁচটায় উড়ে জয়পুর বিকেল ছটা পাঁচে; তারপর জয়পুর থেকে ইন্দিগো ৬ই ১৭৫, এয়ারবাস এ ৩২০ তে রাত নটা পঞ্চাশে উড়ে কলকাতা রাত বারোটা দশে। পরিবর্তনের ফলে আমি তিনটে জিনিস হারালাম; (১) সাড়ে তিন হাজার টাকা, নতুন করে টিকিট কাটতে বেশি লাগল; (২) দিল্লি বিমানবন্দরে ঘোরাঘুরি, কেনাকাটা ও কফি খাওয়ার সুযোগ; (৩) বোয়িং গোত্রের উড়োজাহাজে চাপার সুযোগ। বোয়িং বিমানে আমার খুব একটা ওঠা হয় না। পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সফল যাত্রী পরিবহনকারী জেট বিমানপোত কিন্তু এদেরই, ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৯ অবধি তৈরি হওয়া বোয়িং ৭০৭। মাঝারি আয়তনের, লম্বা সফরের সরু চেহারার চার ইঞ্জিনের এই সেভেন ওহ সেভেন এক কিংবদন্তী; পরবর্তীকালে এর হাত ধরেই এসেছে ৭২৭,৭৩৭,৭৪৭, ৭৫৭,৭৬৭, ৭৭৭,৭৮৭। ষাট সত্তরের দশকে আকাশ দাপিয়ে বেড়িয়েছে এই বোয়িং ৭০৭। রাজারহাট রোড ধরে চিনার পার্ক ছাড়িয়ে যে দশদ্রোণ গ্রাম, সেখানে লস এঞ্জেলেস থেকে রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে স্বল্প দৃশ্যমানতায় ভিসুয়াল অ্যাপ্রোচে কলকাতা নামতে গিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে রানওয়ের ১১২৮ মিটার আগে ভেঙে পড়েছিল Pan Am Flight 1, Clipper Caribbean, বোয়িং ৭০৭ - ৩২১, ১৯৬৮র বারোই জুন। আমার মনে আছে কারণ পিসেমশায়ের হাত ধরে মাঠ পেরিয়ে আমি উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ার মত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দেখতে গিয়েছিলাম; আমার পিসিমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল এরোপ্লেনভাঙ্গা দিয়ে বাসন তৈরি হয়। সেটা ষাটের দশকের গোড়া, তদবধি মধ্যবিত্তের হেঁসেলে কলঙ্কমুক্ত ইস্পাত তো দূরস্থান, তার গরীব খুড়তুতো ভাই হিন্দালিয়াম অবধি ঢোকেনি। সাবেকি লোহার বাসনের জায়গা সবে নিচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম; জনমানসে তাইই এরোপ্লেন ভাঙ্গা। এরোপ্লেনভাঙ্গা আনতে পিসেমশায় হাতে করে একটা রেশন ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিলেন তাও মনে আছে।

সোয়া তিনটেয় হোটেল থেকে বেরিয়ে বিমানবন্দর; আদিগন্ত ঊষর মাঠ। সাড়ে চারটেয় উড়োজাহাজটি নামলেন, লোকজন মালপত্র নামলো, তেল ভরা হল। আমরা উঠে পড়লাম। আসন সামনের সারির ডান দিকে। অনেক নিচু দিয়ে উড়ে জয়পুর। তারপর তল্পিতল্পা নিয়ে আগমন লাউঞ্জ দিয়ে বেরিয়ে আবার নির্গমন লাউঞ্জে। জয়পুর ছোট বিমানবন্দর বলে রক্ষে, এই ব্যায়াম অন্যত্র করতে হলে পা ব্যথা হয়ে যেত। আবার চেক ইন, বোর্ডিং পাস নেওয়া। টার্মিনালে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি, কেনাকাটা, খাওয়া দাওয়া ও হিমশীতল কফিপান। আমাদের উড়োজাহাজ (VT IHG) বেঙ্গালুরু থেকে হায়দ্রাবাদ হয়ে এসে নামলেন রাত নটা কুড়িতে। তার আজকের নির্ঘণ্টে কলকাতাই শেষ গন্তব্য। তিনি এলেন, আমরাও উঠে বসলাম। আসন প্রথম সারির বাঁদিকে, জানালার পাশে। তিনি মেঘের দেশে যাওয়ার আগেই আমরা ঘুমের দেশে। কিন্তু শান্তি নেই, বিমানবালা খেতে ডাকলেন। একবার দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছিলাম রাত দুটোর উড়ানে। মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে বিমানসখির খাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি; বলেন তুমি না খেলে নিয়ে যাও। এবারেও সেই জ্বালা! তারপর দমদম।

পুনঃ - অনেকেই বেড়াতে যাওয়ার আগে সম্ভাব্য খরচের একটি ধারণা পেতে চান। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এরোপ্লেন ভাড়া ৩৩৫১৫, হোটেলভাড়া ৯৬৮০, খাইখরচ চা মিনেরাল ওয়াটার লস্যি ৬৭০৩, গাড়িভাড়া ১৯০৮০। কেনাকাটা ও পূজার খরচের তো কোন উর্দ্ধসীমা হয় না।

- সমাপ্ত -

রাজস্থানের তথ্য ~ *রাজস্থানের আরও ছবি*

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা। সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইয়েলোস্টোন পার্কে

কালীপদ মজুমদার

জুন মাসের এক মিষ্টি বিকেলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়মিং রাজ্যের অন্তর্গত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের গার্ডিনার গেটে এসে পৌঁছালাম আকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। গেটে টিকিটের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ পার্কের একখানা ম্যাপও আমাদের হাতে দিয়েছিলেন। সেই মানচিত্র অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে যেতে শুরু হল পাহাড়ি পথ। আঁকাবাঁকা পথের দুই কিনারের পাহাড়ে চিরসবুজ পাইনের শোভা আর ঘন সবুজে আবৃত উন্মুক্ত তৃণভূমি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হু হু করে নেমে এসেছে পথের কিনারে। সেই শ্যাম তরুরাজি আর কোমল তৃণভূমির অপরূপ শোভা সহজেই সকলের মন হরণ করল। খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও মস্ত পাথরের চাঁই এমন ভাবে ঝুলছে যে মনে হয় এখুনি হয়ত খসে পড়বে সেই বিকট পাথর। একবার খসে পড়লেই কী যে অনর্থ ঘটবে ভাবতেই ভয়ে চোখ বুজে আসে। পথ মাঝে মাঝে এমন বাঁক নিচ্ছে যে মনে হয় কী যেন অদেখা রয়ে গেল সেই ফাঁকে। পথের কিনারের পাইনের পল্লবে পাতায় চঞ্চল প্রাণের স্পর্শ দেখে মনে হল এমন অপরূপকে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে একটু আদর করে যাই।

আসার পথে লিভিংস্টোন বলে একটা জায়গা থেকে পার্কের পথ ধরেছিলাম। তখন থেকেই ইয়েলোস্টোন নদী কখনও কাছে, কখনও দূরে - সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। চলতে চলতে পথ একজায়গায় দুভাগ হল। বাঁ হাতের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। সেই পথে দেখে নিলাম আনডাইন ফলস আর ফ্যান্টম লেক। মাথার ওপরে আধখানা চাঁদের মতন বাঁকা রুজভেল্ট আর্চের তলা দিয়ে পথ। ইতিমধ্যে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। বিরাট শূন্যতার মাঝে কোথাও কোনও প্রাণের সাড়া নেই। সেই তুলনাহীন শোভার মাঝে যখন বিভোর হয়েছিলাম এমন সময় আচমকা কড়াৎ করে মেঘ ডেকে উঠল। সেই অপরাহ্ন বেলার আকাশ জোড়া নিকষকালো মেঘের সন্মিলনে অসময়ে বুঝি সন্ধ্যার আগমন ঘটল। নির্জন,নিঃসীম বিরাটের আঙ্গিনা জুড়ে এক এক বার বিদ্যুতের ঝলকে সমুখের অজানা পাহাড় আর বনভূমি আমাদের সামনে এক রহস্যপুরীর মতন হয়ে দেখা দিল। মেঘের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে চললাম। সামনে বিপুল জলের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। পৌঁছে দেখি দুর্বার ইয়েলোস্টোন নদী উঁচু পাথরের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে টাওয়ার ফলস। এই পাহাড় আর প্রকৃতি ইয়েলোস্টোনের জন্মভূমি। পাহাড়ের বুকে নদীর উদ্দামতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম।

ক্রমে আলো কমে আসতে লাগল। এবার মাইল কুড়ি দূরে রাতের আস্তানা ক্যানিয়ন লজের পথ ধরলাম। বন্ধুর পথ একসময় ওপরে উঠতে লাগল। পথের দুই কিনারে আধপোড়া পাইনের সারি দেখে জানতে পারলাম ১৯৮৮ সালে ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকান্ডে বাইশ লক্ষ একর আয়তনের এই পার্কের প্রায় সাত লক্ষ একরের মত অঞ্চল পুড়ে যায়। দগ্ধ বৃক্ষকুল আজও তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক সময় আমরা চলে এলাম বরফের দেশে। সেখানে মহাশূন্যের বুকে অসীম শুভ্রতা চারদিকে বিস্তার করে চলেছে।

এক রূপকথার অনুভূতি। তুষার পথের ৮৮৫৯ ফুট উঁচু শীর্ষবিন্দু-'ডুনরাভেন পয়েন্ট'-এ যখন উঠে এলাম,মুহূর্তে আদিগন্ত বিস্তৃত রজত শোভার বুকে হারিয়ে গেলাম আমরা। চারদিকের দূর প্রসারিত নৈসর্গিক শোভা এক সম্মোহনী মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে চরাচরের বুকে। সেই রূপসাগরের সৌন্দর্যে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পরে এসে আশ্রয় নিলাম রাতের ঠিকানা ক্যানিয়ন লজে। গভীর রাত্রে চাঁদের আলোয় হোটেলের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের তুষারাবৃত প্রকৃতির শোভা দেখে মন ভরে গেল।

পরদিন ভোরে আবার বেরিয়ে পড়লাম পার্কের বিখ্যাত গাইসার অঞ্চল দেখব বলে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য দূরের 'নরিস গাইসার বেসিন'। বাতাসে ঠান্ডার কামড়। পথে পড়ল ওয়াশবার্ন হট স্প্রিং আর 'লোয়ার ফলস'। লোয়ার ফলসে আবার দেখা ইয়েলোস্টোন নদীর সঙ্গে। নদী এখানে দুরন্ত বেগে পাহাড়ের ওপর থেকে সশব্দে লাফিয়ে পড়ছে অনেক নীচের পাথরের বুকে। সফেন জলরাশির গর্জন আর উন্মত্ততা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। দেশ বিদেশের কত মানুষ যে জড়ো হয়েছে এই সুন্দরের আঙ্গিনায়। দক্ষিণে, দূরের ফোর্ট্রেস মাউনন্টেনের তলার দিক থেকে ইয়েলোস্টোন নদীর উৎপত্তি। সেখান থেকে এসে ইয়েলোস্টোন লেক হয়ে সে নদী চলে গেছে পূবের নর্থ ডাকোটা রাজ্যের দিকে। লোয়ার ফলস থেকে নেমে অনেক নীচের এক মহা ভয়ঙ্কর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে পথ করে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে সেই নদী। দুই কিনারে তার হেলান দেওয়া ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড়। সেই দীর্ঘ পাহাড়ের দেওয়ালে নানা রঙের পাথরের সমাবেশ দেখে অবাক হলাম। দূরে, অনেক নীচের গভীরে ক্ষীণ রেখার মতন বয়ে চলেছে নদী। সেদিকে তাকিয়ে গা শির শির করতে লাগল। এই

গিরিখাত-ই বিখ্যাত 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান অফ ইয়েলোস্টোন' নামে পরিচিত। এবার নদীর উৎস মুখের দিকে উঠে দেখা পেলাম আপার ফলসের। নদীর গর্জনের সঙ্গে জলের ছটার বুকে আলোর বিচ্ছুরণের সে কী শোভা! শিশু আর বৃদ্ধ সহ বহু মানুষের আনন্দ কলতানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে।

নদী অঞ্চল ছেড়ে নরিসের প্রস্রবণের এলাকায় যখন এলাম, পথের কিনারের গাছপালার আড়াল পার হতেই সামনে দেখতে পেলাম সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের বুকে উষ্ণ প্রস্রবণের মেলা বসেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে একটির ওপরে নরিস গাইসার বেসিন অবস্থিত এবং এটি একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলও বটে। কাঠের পাটাতনের পথ ধরে পায়ে পায়ে চলে এলাম নীচের বিরাট খোলা প্রান্তরের বুকে। চার দিকে কেবল বাষ্প কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে নিরন্তর আকাশে উঠে চলেছে। এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম কুন্ডের বুকে টগবগ করে ফুটছে কাদা। সে যেন ভাত ফোটার শব্দ। কোথাও মনে হয় চচ্চড়ি রান্নার শব্দ, আবার কোথাও ফোঁস ফোঁস শব্দ। এমন কত বিচিত্র ধ্বনি যে শোনা যায় প্রতিটি গাইসার থেকে যা আমাদের পরিচিত শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। তপ্ত জলের কুন্ড, ফুটন্ত কাদা, আর বাষ্পের ধোঁয়া এমন নানা রকমের প্রস্রবণের বুকে কত রকমের যে বিস্ময়কর রঙের খেলা যা দেখে মুখে কথা সরে না। পিনহুইল, স্টীমবোট, হোয়েলস মাউথ, কংগ্রেস, মনার্ক, এমন অসংখ্য গাইসার আর পোর্সিলিন, ইয়েলো ফানেল, ব্লু মাড, এমারেল্ড এমন নানা হট স্প্রিং, কত নাম আর কত চরিত্র তাদের। সংখ্যায় যেমন অগুনতি, রূপেও তারা অবর্ণনীয়। তবে নরিসের বিস্ময় স্টিমবোট গাইসার। এই প্রস্রবণটি পৃথিবীর উচ্চতম সক্রিয় উষ্ণ প্রস্রবণ। কখনও কখনও তার উৎক্ষেপণ উচ্চতা তিন থেকে চার'শ ফুট পর্যন্ত উপরে পৌঁছে যায় এবং সক্রিয়তা বারো ঘন্টা পর্যন্তও স্থায়ী হতে পারে।

বিকেল হয়ে আসছিল। নরিসের বিস্তীর্ণ প্রস্রবণ অঞ্চল ছেড়ে এবার চললাম পার্কের উত্তর সীমানার ম্যামথ হট স্প্রিং এলাকার দিকে। পথে এল 'রোরিং মাউন্টেন'এবং'অবসিডিয়ান ক্লিফ' আর ইন্ডিয়ান ক্রীক। দেখলাম সোয়ান লেক। পথ চলতে চলতে পাহাড়ের ঢালে দেখা হল সারা গা লম্বা

লম্বা লোমে ঢাকা বাইসন পরিবারের সঙ্গে। তারা কিন্তু শান্ত নয় তেমন। পাহাড় আর দূর বিস্তীর্ণ উদার শ্যামল প্রকৃতির মাঝে ছোট ছোট নালার বুকে স্বচ্ছ নীল জলধারা আর পথে প্রান্তরে সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা চোখ ভোলানো প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে মন হরণ করে চলেছে। সেই অসীম সুন্দরের বুকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা হল বাদামী ভালুক, গ্রিজলি বিয়ারের সঙ্গে। তবে সে দেখা মুখোমুখি দেখা নয়। কিছুটা দূর থেকে দেখা। পড়ন্ত বিকেলে ঢেউ খেলানো সবুজ প্রান্তরের পথে একা সে চলছিল আপন মনে। যেমন অতিকায় তার চেহারা তেমনি তার স্বাস্থ্য। চলতে চলতে একসময় নালার ঢালে হারিয়ে গেল সে। বিরাট আকাশের নীচে দিকে দিকে কত রকমের মনভোলানো সুন্দরের ছবি আঁকা। ম্যামথের একটু আগে পাহাড়ের ঢালে একটা মরা গাছের ওপরে দেখি ছোট একটা কালো ভালুক চুপটি করে বসে আছে। তবে সে বসা কেবল ক্ষণিকের জন্য মাত্র। সেই চঞ্চল ভালুক এমন দুষ্টু যে মানুষের জটলা দেখে তার উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। তার দুষ্টুমি দেখে আমাদের হাসি আর ধরে না।

ম্যামথের রাতের আশ্রয়ে এসে দেখি আর এক বিপত্তি। আমাদের ঘরের সামনে কতকটা নীলগাই-এর মতন দেখতে এক 'মুজ' দাঁড়িয়ে রয়েছে। হোটেলের নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে বাবা-বাছা করে যতই সরাতে চায় ততই সে বেঁকে বসছে। কোনরকম আঘাত বা অত্যাচার করা যাবে না, দেশের এমন নিয়ম মানতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন তারা। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি পিছনের টিলার ওপরে, গাছের তলায়, পথের কিনারে নানা জায়গাতেই তারা অনেকে ঘোরাঘুরি করছে। কিছুতেই যখন নড়ানো গেলো না সেই গোঁয়ারগোবিন্দকে,একসময় সুযোগ পেয়ে টুক করে তার পিছন দিয়ে গিয়ে উঠলাম ঘরের বারান্দায়। অনেক রাত্রে কাঁচের জানলা দিয়ে পিছনের ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় একপায়ে দাঁড়ানো একটা গাছের পিছনে চাঁদের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

পরদিন ভোরে প্রথমেই গেলাম হোটেলের কাছে 'ম্যামথ হট স্প্রিংস' দেখতে। সে যেন স্তরে স্তরে সাজানো পাথরের প্রাসাদ। মাটির গভীর থেকে খনিজ মিশ্রণের তপ্ত জলের ধারা উঠে আসছে ওপরে। পাষাণ-প্রাসাদের ছাদের ওপর দিয়ে সেই মিশ্রণের তপ্ত জলধারা অবিরাম গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে। খাড়া পাথরের চওড়া ছাদের ওপরে,বিভিন্ন খোপে এবং দেওয়ালে কত রকমের যে রঙের বাহার খুলেছে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন! স্তরের ওপরে স্তরে রঙের বিন্যাস। উজ্জ্বল দুধসাদা মেঝের বুকে কত যে রঙের সমাবেশ হয়েছে সেখানে। সে শোভা এমন অপরূপ সুন্দর আর ঝলমলে যে চোখ সরিয়ে আনা দুষ্কর। সেই গরম জলের কিনারে দেখলাম কাদাখোঁচা পাখিরা তাদের খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে। কল্পনার সেই পাষাণ-প্রাসাদের নীচে এসে দেখি পাহাড়ের ঢালে আর দিকে দিকে ফোটা ফুলের মেলা বসেছে। ধরার আঙ্গিনার বুকে সেই অনাবিল ফুলের হাসি জীবনের সব গ্লানি মুহূর্তে ধুয়ে নিয়ে গেল। দূরে আকাশচুম্বী নীল পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষার শোভা, নীচে শ্যামল বনানীর সীমাহীন ঢেউ-এর তলে নয়ন মনোহর ফুলের বুকে মৌমাছিদের মেলা। শীতল বাতাস আর মিষ্টি রোদের সঞ্জীবনী ধারায় সেই সুন্দরের দেশের সব মধুময় হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে সে জায়গা ছেড়ে আমরা চললাম পার্কের শেষ দক্ষিণের বিখ্যাত 'ওল্ড ফেইথফুল' গাইসারের দিকে। এই গাইসারটি বিশাল এই পার্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রায় দশ হাজার তপ্তকুন্ডের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নাম। ইয়েলোস্টোন লেকের পাশ দিয়ে চলেছিলাম আমরা। সেখানে লেকের কিনারে বরফঠান্ডা জলের তলা থেকে জায়গায় জায়গায় ফোয়ারা দিয়ে নিরন্তর গরম জল উঠে আসতে দেখে অবাক হলাম। সারাটা লেকের তলায় নাকি এমন অজস্র তপ্তকুন্ড ভরা। এমন বৈপরীত্যভরা দৃশ্য এই পার্কের সর্বত্রই দেখা যায়।

একসময় আমরা চলে এলাম লোয়ার এবং মিডওয়ে গাইসার বেসিন অঞ্চলে। ফায়ারহোল নদীর সুগভীর নীল জলের তীরে অনাদি প্রান্তরের বুক জুড়ে যে সংখ্যাহীন প্রস্রবণের মেলা বসেছে তার বর্ণনা দেবার সাধ্য কোথায়। তবে সেখানে 'মিডওয়ে গাইসার বেসিন' অঞ্চলে সকল শোভার সেরা ইয়েলোস্টোনের বৃহত্তম হট স্প্রিং 'গ্র্যান্ড প্রিসমেটিক' স্প্রিং-এর সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। সেই প্রস্রবণের কিনারা ঘিরে অপরূপ হলুদ এবং কমলা রঙের বলয় রেখার মনভোলানো শোভা। ৩৭০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট সেই তপ্ত জলকুণ্ডের তলদেশ থেকে সুগভীর পান্না রঙের যে আভা উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে তেমন শোভা যেমন বিরলেরও বিরলতম তেমনি দুর্লভও বটে। বর্ণালী আভার সেই শোভায় পলকেই মোহিত হয়ে গেলাম সকলে। এমন রঙের বিন্যাস একমাত্র প্রকৃতির ভান্ডারেই সম্ভব। গ্র্যান্ড পিসমেটিক-এর দুর্লভ শোভা জীবনের এক অমূল্য অনুভূতি। গ্র্যান্ড প্রিসমেটিকের শোভা দেখে শেষ বিকেলে 'ওল্ড ফেইথফুল'-এর খোলা মাঠের সামনে যখন এলাম তখন সেখানে চারদিকে একটা শূন্যতার পরিবেশ। সেই মাঠের কিনারের দেখলাম একটা জায়গা থেকে মাঝেমাঝে সামান্য ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে আর একটু একটু বাষ্প বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে। জায়গাটার সামনের দিকে একটু তফাতে অর্ধচন্দ্রাকারে বানানো সিমেন্টের লম্বা বেদি। বহু মানুষ সেখানে পাশাপাশি এক সঙ্গে বসতে পারবে। কচ্ছপের পিঠের আকৃতির সেই খোলা মাঠের শেষ সীমানা ঘেঁসে অরণ্যশোভিত পাহাড় নীরবে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এদিক ওদিকে কিছু তপ্ত জলের কুণ্ড। সবুজ বলয়রেখার পাহাড়ের নীচ দিয়ে নালা বয়ে চলেছে তির তির করে। এখানে ওখানে কিছু মানুষজন ঘোরাঘুরি করছে। চারদিকে কেমন একটা শূন্যতার ভাব। জায়গাটাকে দেখে আহামরি তেমন কিছু মনে হল না। তবুও ভাবলাম, এসে যখন পড়েছি দেখেই

যাই। সিমেন্টের বেদীতে পছন্দ মতন একটা জায়গা দেখে বসে আছি। ধীরে ধীরে লোক সমাগম বাড়তে লাগল। বসবার জায়গাটাও ভরে গেল ক্রমে। একসময় লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাবটাও বেড়ে উঠল। বড় বড় ক্যামেরা দাঁড় করিয়ে কয়েকজন ক্যামেরাম্যান বার বার ঘড়ি দেখছেন। বুঝলাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সারা এলাকাটা কখন যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল খেয়াল করিনি। চারদিকে নজর ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার। হঠাৎ বিকট শব্দে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি সামনের সেই জায়গা থেকে বিপুল গরম জলের ফোয়ারা সবেগে ঠেলে উঠছে আকাশের অনেক ওপরে। জল, বাষ্প, গর্জন আর আমাদের উচ্ছাস, সব কিছু মিলে সে এক সমুদ্রমন্থনের কল্লোল। অবাক হয়ে সেই বিস্ময়ের দিকে চেয়ে আছি অপলক দৃষ্টিতে! আকাশের অনেক ওপরে উঠেই চলেছে বাষ্পমিশ্রিত সেই দুরন্ত জলরাশি। মিনিটখানেকের বেশি সময় ধরে সেই গর্জনের তান্ডব চলল সমানে। মনে হল মহা এক অঘটন ঘটে চলেছে পৃথিবীর বুকে। ছবি তোলার হিড়িক পড়ে গেল সকলের মধ্যে। তারপর যেমন হঠাৎ তার উৎপত্তি, তেমনি হল তার বিলয়। মনে হল এতক্ষণ বুঝি স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখতে দেখতে লোকজন ফাঁকা হয়ে গেল। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ঘন্টা দেড়েক পরে পরে তার এই উচ্ছ্বাস চলে আসছে অবিরাম। নিয়মিত তার এমন স্থির আর নিশ্চিত উচ্ছ্বাস থেকেই কি এমন নাম পেল সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর?

নানা রকম প্রাণী আর অরণ্যবৈচিত্র্যে ভরা এই পার্কের একদিকে গাইসার আর হট স্প্রিং-এর শোভার আবেদন। আবার বাষ্পধারার কুন্ডলীর কিনারে কিনারে, পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছপালার সারি। এমন বিপরীতের মাঝে দূরে শৈল শিরে শিরে তুষার শোভা। লেকের বিপুল নীল-সবুজ শীতল জলরাশির তলে উষ্ণ ফোয়ারার চমৎকার। নীল আকাশের নীচে এমন নানা অজানা রহস্য আর সুন্দরের আদিগন্ত বিস্তৃত শোভা দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। তবে যতটুকু দেখলাম তার অনেক বেশি রয়ে গেল অদেখা,অজানা। তৃপ্তি আর পিপাসা নিয়ে ইয়েলোস্টোন পার্কের দক্ষিণের জ্যাকসন হয়ে আমরা ফিরে চললাম আপন আস্তানায়।

এই পার্কের পাঁচটি প্রবেশপথে আছে। তার মধ্যে উত্তরে ইউ এস ৮৯ হয়ে গার্ডিনার প্রবেশপথ, ইউ এস ২১২ ধরে কুক সিটি আর সিলভার গেট হয়ে উত্তরপূবের প্রবেশপথ - এই দুটি গেট সারা বছর খোলা থাকে। বাকি ইউ এস ২০ হয়ে পশ্চিম ইয়েলোস্টোন পথ, ইউ এস ৮৯ দিয়ে জ্যাকসন হয়ে দক্ষিণের পথ আর ইউ এস ২০-১৬-১৪ ধরে কোডি হয়ে পূবের পথ, এই প্রবেশ দ্বারগুলি শীতকালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (জি এস আই)-এর প্রাক্তন কর্মী কালীপদ মজুমদার দীর্ঘ কর্মজীবনে নিযুক্ত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানান প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে। অবসরগ্রহণের পর সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ আসে। সেখানে অবস্থানকালে বিরাট সেই দেশের সামান্য কিছু অংশ ভ্রমণের সুযোগ হয়। সেইসব ভ্রমণকাহিনি লেখার জন্যই 'আমাদের ছুটি'-তে কলম ধরা।

শ্রীলঙ্কায় দিনকয়েক

অরীন্দ্র দে

~ *শ্রীলঙ্কার আরও ছবি* ~

দক্ষিণের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা রাজনৈতিক, জাতিগত, এবং মহাকাব্যিক কারণবশত আমাদের খুব কাছের। স্বর্ণলঙ্কার গল্প তো আমরা সবাই জানি। দেবতাদের বাস্তুবিদ বিশ্বকর্মা স্বর্ণলঙ্কা বানিয়েছিলেন হর-পার্বতীর জন্য; সদ্যবিবাহিত হর-পার্বতীর একটি মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের বড় দরকার ছিল। গৃহপ্রবেশের জন্য মহাদেব আহ্বান করলেন সপ্তর্ষির অন্যতম পুলস্ত্যকে; তিনি পৌরোহিত্যের পারিশ্রমিক চেয়ে বসলেন গোটা প্রাসাদটাকেই। শিব-পার্বতী আর কী করেন; প্রাসাদ ঋষিকে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন কৈলাস পর্বতে। ক্রমে সেই প্রাসাদ লাভ করলেন পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র কুবের; তারপর কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ। এই স্বর্ণলঙ্কাতেই বন্দিনী ছিলেন রামায়ণের সীতা। প্রসঙ্গত, পুলস্ত্য সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major)-এর একটি নক্ষত্র (ইংরেজি Phad বা Phecda; Gamma Ursae Majoris) পৃথিবী থেকে দূরত্ব প্রায় ৮৩.২ আলোকবর্ষ।

বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে; আর কে না জানে প্রমোদভ্রমণে অধিকাংশ বাঙালিরই উৎসাহী, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। অফিসে একদিন এলেন প্রাক্তন সহকর্মী টি.কে.দা (টি.কে. মুখার্জি), তিনিই মাথায় ঢোকালেন। বললেন, বসে বসে 'তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা' গেয়ে কি হবে, চ' স্বর্ণলঙ্কা ঘুরে আসি।

উঠলো বাই তো কটক যাই, এক্ষেত্রে কটকটা কলম্বো, এবং তথায় আমাদের পদার্পণ স্থানীয় সময় রাত দুটোয়। তারিখটা ২০শে মার্চ, ২০১৬। ভোর হতেই আমাদের সারথি-তথা-গাইড মিস্টার অশান্তর অনুবর্তী হয়ে আমরা কলম্বোর উত্তর পূর্বের ছোট শহর সিজিরিয়ার পথে, কলম্বো থেকে প্রায় ঘণ্টা চারেক।

হুরুলা ইকো পার্ক

হোটেল বুক করাই ছিল; সান শাইন ভিলা সিজিরিয়া। সিজিরিয়া (সিংহ গিরি) প্রায় গ্রাম, গ্রামের চারপাশে জঙ্গল, তবু লোকে এখানে আসে সিজিরিয়া লায়ন রক দেখতে। অপরাহ্নের হুরুলা ইকো পার্কে হাতির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে সাপ, ময়ূর (দুজনের খাদ্য খাদক সম্পর্ক কিন্তু দেখা গেল বেশ মিলেমিশেই এখানে আছে), আর পাখপাখালি। হাতিরা যখন রাস্তা পেরোয়, গাড়িঘোড়া সশ্রদ্ধে থেমে যায়। তবে দুঃখের কথা এই

যে এখানেই আমার ক্যামেরা বিগড়োল, বাকী ট্রিপটা তাই নিয়েই ভুগতে হল।

পরদিন সকালে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট - সিজিরিয়া লায়ন রক; ভারতীয়দের জন্য প্রবেশমূল্য অর্ধেক। বারোশো সিঁড়ি ভেঙে অতিকায় রকফোর্ট্রেসটি দেখতে ঘণ্টাতিনেক লাগল। প্রাকৃতিক পাথরের কলাম সোজা উঠে গেছে সাড়ে ছশো ফুট; তার ওপর থেকে নিসর্গ অতি মনোরম। পঞ্চম শতকে রাজা কশ্যপ তাঁর রাজধানী তুলে আনেন এখানে। অট্টালিকা, হর্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে সরণি, জলাশয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সমাহার। রাজা কশ্যপ তার রাজধানী তৈরি করেছিলেন প্রস্তরশিখরে; পাথরের দেওয়ালের গায়ে রঙিন ফ্রেস্কো। ওঠার রাস্তার মাঝবরাবর ক্ষুদ্র এক উপত্যকায় সিংহ-আকৃতির এক অতিকায় তোরণ, তার নামেই জায়গার নাম সিংহগিরি। রাজামশাইয়ের মৃত্যুর পর রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হয়, ভবনটি বৌদ্ধমঠ রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে চতুর্দশ শতক অবধি।

সিজিরিয়া লায়ন রক

সিংহগিরি দেখে আমরা সেই সকালেই ক্যান্ডির পথে। পথিমধ্যে দ্যাম্বুল্লার স্বর্ণমন্দির দর্শন। এক অতিকায় বুদ্ধমূর্তি বহুদূর থেকেই দৃশ্যমান। দ্যাম্বুল্লা শ্রীলঙ্কার সর্বাপেক্ষা সযত্নরক্ষিত গুহামন্দির; বাইশ শতাব্দীর তীর্থস্থান, সন্নিহিত সমতল থেকে ১৬০ মিটার উঁচু; এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খান আশি গুহা, পাঁচটি স্যাঙ্কচুয়ারি, ২১০০ বর্গমিটার জুড়ে দেয়ালচিত্র (ম্যুরাল), একশো তিপ্পান্নটি বুদ্ধমূর্তি, সবই গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা পর্যায় নিয়ে। আর তিনটি মূর্তি শ্রীলঙ্কার রাজারাজড়ার ও চারটি মূর্তি বৌদ্ধ দেবদেবীদের। হীনযানে দেবদেবী নেই; মহাযানে বুদ্ধই দেবদেবী; আর সহজযানে মানুষের দেহেই দেবদেবীর অধিষ্ঠান। বৌদ্ধ দেবদেবীর আসল উপস্থিতি বজ্রযানে, আর সেই দেবদেবীরা আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য!

গোল্ডেন টেম্পল, দ্যাম্বুল্লা

ক্যান্ডির পথে যেতে যেতে একটা স্পাইস গার্ডেন দেখা হল, নানাবিধ ভেষজ তথা আয়ুর্বেদীয় জিনিসপত্র সেখানে বিক্রি হচ্ছে। মশলাপাতির গাছ দেখে আমরা ক্যান্ডি পৌঁছলাম। ক্যান্ডি মধ্য শ্রীলঙ্কার একটি বড় শহর, পাহাড়ঘেরা উপত্যকার মাঝে; পাহাড় জুড়ে নিরক্ষীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। ক্যান্ডি (বোগামবারা) হ্রদ এই শহরের হৃৎপিণ্ড, লোকজন খাওয়া দাওয়া সেরে সেখানে হাঁটতে যায়। ক্যান্ডি বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধস্মারকসমূহের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার দন্তমন্দির (Temple of the Tooth; Sri Dalada Maligawa) জগদ্বিখ্যাত। শ্রীলঙ্কার রাজাদের শেষ রাজধানী ছিল ক্যান্ডি। পূর্বতন ক্যান্ডিরাজত্বের রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই মন্দির। আমাদের দাঁতনের মত এখানেও শাক্যমুনির দন্ত রক্ষিত। লোককাহিনি বলে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ সালে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর, বিহারের কুশিনগরে চন্দনকাঠের চিতায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি হয়। দাহকার্যের পর বুদ্ধদেবের শিষ্য ক্ষেমা চিতা থেকে তাঁর বাম শ্বদন্ত সংগ্রহ করে রাজা ব্রহ্মদত্তকে তা অর্পণ করেন। রাজকীয় সংগ্রহের সেই বুদ্ধদন্ত থেকেই দন্তপুরী, আজকের পুরী। বুদ্ধদন্ত অধিকারে থাকলে পৃথ্বীশাসনের অধিকার জন্মায়, এই ধারনা থেকেই কলিঙ্গরাজের সঙ্গে পান্ডুরাজের বুদ্ধদন্তের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ লাগে। তখন বুদ্ধদন্ত সিংহলে যায়; অভয়গিরি বিহার তার জিম্মাদার নিয়োজিত হন।

বুদ্ধদন্তের অধিকার নিয়ে টানাপোড়েন চলতেই থাকে; বর্মার বোগোর রাজা পর্তুগিজদের জলদস্যুদের লোভ দেখান, বুদ্ধদন্ত দিলেই হাতে গরম টাকা। রাজধানী স্থানান্তরিত হতে থাকে, অনুরারাধাপুরম থেকে পোলোন্নারুয়া, সেখান থেকে দমবেদানিয়া; পরিশেষে বুদ্ধদন্ত ক্যান্ডিতে। ক্যান্ডির আরেক আকর্ষণ কালচারাল সেন্টার - প্রতি সন্ধ্যায় লোকনৃত্যের আসর বসে সেখানে।

ক্যান্ডির দন্তমন্দির

পরবর্তী গন্তব্য জেলা শহর নুয়ারা এলিয়া (সমতলের শহর); মধ্য শ্রীলঙ্কার শৈলশহর। চা বাগান, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া, সরলবর্গীয় গাছ গাছালি... যেন ফেলে আসা দার্জিলিং। শ্রীলঙ্কার চায়ের খ্যাতি তো এখন বিশ্বজোড়া - তার মধ্যেও আবার সেরা নুয়ারা এলিয়ার চা। পাহাড়ের উপর থেকে নৈসর্গিক শোভা অতি মনোরম। এখানকার হাকগ্লা বোটানিক্যাল উদ্যান উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। পাশেই বর্ণাঢ্য ও জমকালো সীতা আম্মান মন্দির, শ্রী বক্ত হনুমান মন্দির; হনুমান নাকি এখানকার রাম্বোদা পাহাড় থেকেই সীতা সন্ধান শুরু করেছিলেন। গহন জঙ্গলের মধ্যে গলওয়ে অভয়ারণ্য পাখিবিলাসীদের স্বর্গ।

শ্রীলঙ্কা

সেখান থেকে রাবণ গুহা, রাবণ জলপ্রপাত দেখে ইয়ালা। পথের দৃশ্য অতি মনোরম। পরদিন অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি - উদ্দেশ্য ইয়ালা সাফারি। দক্ষিণপূর্ব শ্রীলঙ্কার ইয়ালা ন্যাশনাল পার্ক অতিবিস্তৃত, ভারত মহাসাগরের গা ঘেঁষে ৯৭৯ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে তৃণভূমি, মধ্যে মধ্যে হ্রদের ছড়াছড়ি - নেকড়ে, চিতা, হাতি, কুমির... এ বলে আমাকে দেখ তো ও বলে আমাকে। ২০০৪-এর সুনামিতে এই উদ্যান খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; কুড়ি ফুট উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রায় আড়াইশো লোক মারা গিয়েছিলেন। সেখানকার হোটেলে খেতে গিয়ে জম্পেশ একটা অভিজ্ঞতা হল। মেনুকার্ড নিয়ে কী খাবো কী খাবো করতে করতে টি.কে.দা ভাত খেতে চাইলেন, অর্ডার দিলাম শ্রীলঙ্কার স্পেশাল রাইসের - তিনি এলেন আটটি পার্শ্বপদ সহ। টি.কে.দা-কে বললাম, বিদেশবিভূঁইয়ে ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি জামাইষষ্ঠী রাতি। পরবর্তী গন্তব্য গল/বেন্তোতা।

ইয়ালাতে সূর্যোদয়

সুনামিতে গল শহর, শহরের ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি সহ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের এই শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য ১৫৮৮ সালে পর্তুগিজদের দ্বারা নির্মিত এখানকার দুর্গটি। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ওলন্দাজরা এটিকে আরও শক্তপোক্ত করে। ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যগত ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অসীম। ধন্য এদের অধ্যবসায়, নির্মাণের ৪২৩ বছর পরেও প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি দরজা ঝকঝক করছে। আমাদের জয়সলমিরের দুর্গের মত এটিও লিভিং ফোর্ট - ভিতরে এখনও শ্রীলঙ্কার সরকারি নিবাসের পাশাপাশি ও ওলন্দাজদেরও বসবাস। ইউনেস্কো একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে - কারণ "an urban ensemble which illustrates the interaction of European architecture and South Asian traditions from the 16th to the 19th centuries."

গলে কিছুক্ষণ থেকে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম বেন্তোতা - ওয়াটার স্পোর্টস, আয়ুর্বেদ ও নারকোলের জল থেকে প্রস্তুত মদ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। সঙ্গে বাড়তি পাওনা ইন্দুরুয়া সৈকতে সামুদ্রিক কচ্ছপের আস্তানা। পরের দিনটা কাটল আরাম করে - সমুদ্রস্নান ও জলক্রীড়ায়।

সকালে জলখাবার সেরে রওনা হলাম কলম্বোর পথে। কলম্বোতে বিশ্বজাহানের আর যে কোনও বড় শহরের মতই সুবিশাল হর্ম্যরাজি, বিশাল সব বিপণি আর আমোদপ্রমোদের আয়োজন। দুর্দান্ত গরমে সারাদিন ঘুরে ঘুরে পুরনো পার্লামেন্ট ভবন, প্রেমদাস ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সৈকত এইসব দেখে ক্লান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় বিমানবন্দর। সারথি মি. অশান্ত নিয়ে গেলেন সুদৃশ্য ক্যানাল রোড দিয়ে । এই খাল কলম্বো বন্দর থেকে শহরের অন্যান্য অঞ্চলে পণ্যপরিবহণের এক অন্যতম মাধ্যম। সারা শ্রীলঙ্কা জুড়েই ছড়িয়েছিটিয়ে দামি মণি-মুক্তোর দোকান - এমনকি জেম মিউজিয়ামো আছে। এখানকার আবহাওয়া সাধারণতঃ প্রচণ্ড গরম, রোদে গা পুড়বেই। শ্রীলঙ্কাকে বিদায় জানিয়ে ২৭শে মার্চ ফেরার প্লেন ধরলাম কলম্বো বিমানবন্দর থেকে।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ শ্রীলঙ্কার ভিসা (ETA- Electronic Travel Authorisation) -এর জন্য আবেদন অনলাইনে http://www.eta.gov.lk/slvisa/ কিংবা http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/fees.jsp?locale=en_US শ্রীলঙ্কা পৌঁছেও ভিসা করে নেওয়া যায়।

(মূল লেখাটি ছিল ইংরাজিতে। অনুবাদ করেছেন শ্রী তপন পাল)

কলম্বো বিচ

~ [শ্রীলঙ্কার আরও ছবি] ~

ভ্রমণ শুধুমাত্র নেশা বা ভালোলাগা নয়, ওইটাই জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী অরীন্দ্র দে-র কাছে। ভালোবাসেন পাহাড়ে চড়তেও। একাধিক হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মাউন্ট ভাগিরথী-(২) সফল অভিযানটির সদস্য ছিলেন। ছবি তুলতে ভালোবাসেন। স্বপ্ন দেখেন জীবনে একটা রাত অন্তত স্পেসস্টেশনে কাটানোর।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

To view this site correctly, please [click here to download the Bangla Font] and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বিনসরে এক বিকেল

অরিন্দম পাত্র

~ *বিষ্ণুপুরের আরও ছবি* ~

নৈনিতাল থেকে চলেছি বিনসরের পথে। আলমোড়া হয়ে যেতে হবে। হোটেল থেকে বলে দিয়েছিল, দাদা এখানে দুটো বিনসর আছে - রাণীক্ষেতের বিনসর মহাদেব আর আলমোড়া হয়ে বিনসরের জঙ্গল। আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম, যাব বিনসরের জঙ্গলে। ড্রাইভার রাজকুমার আগ্রার ছেলে, দিল্লিতে থাকে। নৈনিতালে আগেও এসেছে, কিন্তু এইসব দিক চেনেনা। বললাম "ভাইয়া, আপ ঠিক তারাহ্ সে রাস্তা পাতা কর লিজিয়ে ইন লোঁগো সে..!" তা রাস্তায় খুব একটা অসুবিধা হয়নি। রাজকুমার খুব করিতকর্মা ছেলে। প্রায় চার ঘন্টা লাগল পৌঁছতে। আলমোড়া ঢোকার একটু আগেই দেখা গেল তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গ - সম্ভবত নন্দাদেবী পর্বত। দুচোখ ভরে দেখলাম। আর পড়ল গোলু দেবতার মন্দির, কিন্তু সেটি জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরে, চড়াই উঠতে হয় বলে আর গেলাম না। পাশেই গঙ্গানাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণ দর্শন করে চলে এলাম বিনসর।

আমাদের রিসর্টের নাম ছিল বিনসর ইকো ক্যাম্প। লোকেশন বিনসর ইকো ফরেস্ট জোনে। একটু বেশ খাড়া চড়াই উঠতে হয়। তবে গাড়ি উঠে যায়। তারপর বেশ খানিকটা ভাঙ্গাচোরা কাঁচা রাস্তা। নাচতে নাচতে গাড়ি চলে এল বিনসর ইকো ক্যাম্পের সামনে। প্রবেশ করতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন রিসর্টের হেড কুক কাম ম্যানেজার রমেশজী রডোডেনড্রন ফুলের নির্যাস দিয়ে তৈরি ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়ে। শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ। নৈনিতালের বাসিন্দা। ওনার শ্যালক চন্দনও এখানেই কাজ করেন।

ঘরে গিয়ে লাগেজপত্র রেখে রমেশজীর সঙ্গে পুরো ইকো ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেকগুলি বিভিন্ন ডিজাইনের কটেজ। পুরো জায়গাটা খুব সুন্দর ভাবে সাজানো। চারিদিকে সুন্দর গাছপালা আর ফুলের সমারোহ। প্রচুর থাইম, মিন্ট আর রোজমেরি'র গাছ দেখালেন রমেশজী, যেগুলি থেকে পাতা তুলে

উনি হার্বাল টি বানিয়ে থাকেন (পরে সন্ধ্যার সময় সেই চা আমাদের খাইয়েও ছিলেন)!

খুব জোর ক্ষিদে পেয়েছিল, রমেশজীকে বলতেই উনি বল্লেন "স্যার জি, ডাইনিং রুম মে চলে আইয়ে ফ্রেশ হোকে।" এখানে রুম সার্ভিস নেই।
ডাইনিং হলে দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি সেরে উঠলাম। রমেশজীর হাতের রান্না সত্যিই সুস্বাদু। খাওয়ার পর্ব সারার পরে আলাপ হল এই বিনসর ইকো ক্যাম্পের মালিক, সুদর্শন তরুণ যুবক রবি মেহরার সঙ্গে। রমেশজী আলাপ করিয়ে দিলেন। খুব ভাল মানুষ এই রবিজী। এত বড় প্রপার্টির মালিক, এতটুকুও অহঙ্কার নেই। আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। রবিজী বিদায় নিতে আমরা রুমে চলে এলাম বিশ্রাম নিতে। কিন্তু রমেশজী বলে রাখলেন বিকেল চারটের সময় তৈরি থাকতে, জঙ্গলের মধ্যে অল্প ট্রেক করে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে সানসেট দেখাবেন।

নির্ধারিত সময়ে রমেশজীর সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলাম। হাল্কা চড়াই ভেঙে চলে এলাম পাইন ফরেস্টের ভেতর। আরও বেশ খানিকটা উঠতে হল। একটা ছোট্ট হাট বানানো রয়েছে। ওখান থেকেই সানসেট দেখা যাবে।
জায়গাটা এত চমৎকার যে বলে বোঝানো যাবে না! মেঘহীন আকাশে দিগন্ত জুড়ে বিরাজ করছে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি। নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, চৌখাম্বা, ত্রিশূল, পঞ্চচুল্লী!সে এক দেখার মত দৃশ্য! ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যেতে থাকল, আর তার রঙের ছটা পড়ে সোনারঙের হয়ে উঠল ওই তুষারশৃঙ্গগুলি! পরে অবশ্য আরও কাছ থেকে এই দৃশ্য দেখেছি যথাক্রমে মুন্সিয়ারি এবং কৌশানি থেকে।

চন্দনও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। জানতে পারলাম ভিউ পয়েন্ট থেকে দূরের ঘন জঙ্গলে যাওয়া যায় জীপ সাফারিতেও। অনেক বিদেশি আসেন, তাঁদের জঙ্গল ট্রেকিং-এও নিয়ে যায়। আরো জানাল যে, এই জঙ্গলে অনেক লেপার্ড আছে। আমাকে ছবিও দেখাল ওর মোবাইল থেকে, নাইট সাফারির সময় তোলা। বলাই বাহুল্য এইসবের প্ল্যান আমার মত ভীতু মানুষের ছিল না!

অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখে ধীরে ধীরে নেমে এলাম হোটেলে। সন্ধ্যার স্ন্যাক্স চলে এল, খেয়ে রুমে রিল্যাক্স করলাম বেশ কিছুক্ষণ। রবিজী বন ফায়ারের

বন্দোবস্ত করলেন। অন্যান্য টুরিস্টদের সঙ্গে আমরাও খুব আনন্দ করলাম। তারপর রাতের খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আগামীকাল আমাদের গন্তব্য চকৌরি।

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্র-এর নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

অজন্তা-ইলোরা ছুঁয়ে আসা

পলাশ পান্ডা

আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস যখন আহমেদনগর স্টেশনে পৌঁছাল ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটে। প্ল্যাটফর্মে নামার পর একটু ঠান্ডা অনুভব করলাম। যদিও মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ তবু এখানকার ওয়েদারটাই এমন, সারাবছরই এখানে রাতের বেলাতে হাল্কা ঠান্ডার অনুভূতি থাকে। আগে থেকেই রাজীব তার অটো নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আহমেদনগর স্টেশনটি সুন্দর সাজানগোছানো এবং বেশ পরিষ্কার-পরিছন্ন। অটোতে উঠে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় এলাম পুরোটা ফাঁকা - নগরের ঘুম ভাঙতে দেরি আছে তখনো।

আহমেদনগর জেলাটি মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, অবস্থান পুণের প্রায় ১২০ কিমি উত্তর-পূর্বে এবং আওরাঙ্গাবাদ থেকে ১১৪ কিমি দূরে। আহমেদ নিজাম সাহর নাম থেকেই এর নামকরণ হয়েছিল। ১৪৯৪ সালে পরাক্রমশালী বাহমনি বাহিনীর বিরুদ্ধে আহমেদ নিজাম সাহ এই স্থানে যুদ্ধ জয় করেন এবং তারপর তিনি নিজের নামে এর নামকরণ করেন। আহমেদনগরে এখন রয়েছে ভারতীয় আর্মড কর্প সেন্টার এবং স্কুল। সেখানে সেনাবাহিনিতে নিয়োগ করা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে।

রাজীবের মুখে শুনলাম নগর থেকে কুড়ি কিমি দূরে পিপলগাঁও নামে এক জায়গায় নাকি একটা সুন্দর আঙুরের খেত রয়েছে। পরদিন বিকেল বেলা একটা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নানা রাস্তা ঘুরে শেষে এক সহৃদয় ব্যক্তির কৃপায় সেই আঙুরের খেতটা খুঁজে পেলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে সেই আঙুরের খেতটি, সুন্দরভাবে মাচার ওপর ঝুলে রয়েছে গাছগুলি। একটা সারি থেকে আর একটা সারি মধ্যে প্রায় তিন ফুটের ব্যবধান।। পুরো খেতটি লোহার তার দিয়ে ঘেরা রয়েছে। কিন্তু যে উদ্দ্যম ও কষ্ট সহ্য করে এতদূর এলাম সেই আশা নিভে গেল, যখন দেখলাম আঙুরের খেতে একটাও আঙুর নেই। দেখেই মনে হল, যেন কয়েকদিন আগেই সব আঙুর তোলা হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে, সেই পুরনো প্রবাদ "আঙুর ফল টক" মনে করে যখন ফেরার জন্য মনস্থির করলাম ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একজনের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকটি আমাদের কাছে এসে আমাদের এখানে আসার কারণ শুনে কিছুটা হতাশ হলেন। আজ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির লোক এই খেতটি দেখতে আসার কথা ছিল, আমাদেরকে সেই কোম্পানির লোক বলেই মনে করেছিলেন।

আমরা আঙুর দেখতে না পাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করতে উনি মুচকি হেসে পথ দেখিয়ে খেতের কিছুটা ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকে তো অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, থোকা থোকা আঙুর ঝুলে রয়েছে। কিছু আঙুর এখনো পাকতে দেরি আছে তাই সেগুলো এখনো গাছে রয়ে গেছে। এই প্রথম আমি চাক্ষুষ আঙুরের খেত দেখলাম।

পরদিন আমাদের গন্তব্য প্রায় দুশো কিমি দূরে ইমাজিকা থিম পার্ক। অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হবে, তাই সকাল সকাল গাড়িতে চেপে বসলাম। যখন পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে একটা বাজে। তাড়াতাড়ি গাড়ি পার্ক করিয়ে সোজা টিকিট কাউন্টারে লাইন দিলাম। ইমাজিকা থিম পার্কটি মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার খোপোলিতে তিনশো একর জায়গার উপর গড়ে উঠেছে।

পার্কটি তিনটি ভাগে বিভক্ত -থিম পার্ক, ওয়াটার পার্ক ও স্নো পার্ক। প্রথমে প্রবেশ করলাম 'আই ফর ইন্ডিয়া' তে। এখানে নব্বই ফুট প্রশস্ত পর্দায় ভারতবর্ষের বিশেষ জায়গাগুলিকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন মনে হয় যেন পাখির মতো আকাশে উড়তে উড়তে পুরো ভারতবর্ষটাকে দেখছি। এর পর গেলাম 'প্রিন্স অফ ডার্ক ওয়াটারস – সিনেমা ৩৬০' তে। এখানে মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে মাথার ওপরের পর্দায় ভেসে ওঠা সিনেমা দেখতে হয়। 'মিঃ ইন্ডিয়া শো' টা মূলত রাইডবেসড।

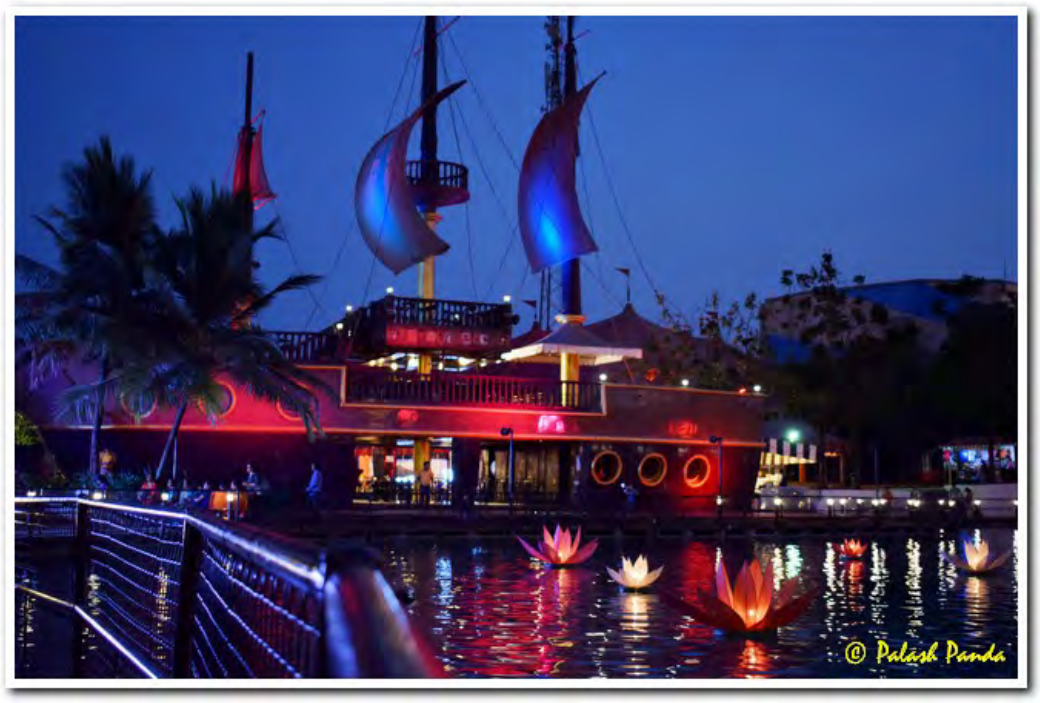

সবথেকে মজার লাগল'রাজাসুরাস রিভার এডভেঞ্চার'। যদিও উইক ডে, তবু এই ইভেন্টে দেখলাম সবথেকে বেশি ভিড়। এটা ছোটদের পক্ষে একটু বিপজ্জনক হওয়ার জন্য আমরা বড়রা তিনজন গেলাম। এইভাবে একে একে ঘুরে নিলাম সেলিমঘর, আলিবাবা আর চল্লিশ চোর, আরো অনেক কিছু। আমার দুর্বল হৃদয় হওয়ার কারণে কিছু ইভেন্ট যেমন নাইট্রো, ফ্রিমার মেশিন, ডিপ স্পেস-এর মত ড্রাইভগুলো বাইরে থেকেই উপভোগ করে কাটালাম। এইভাবে যে কখন ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে তা টের পাইনি। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইমাজিকাটা আলোর রসনায়ে মোড়া হয়ে গেল। আমরাও ফেরার রাস্তা ধরলাম।

তৃতীয় দিন আমাদের গন্তব্য হল অজন্তা ও ইলোরা। আজ অনেকটা পথ যেতে হবে। আগে থেকে গাড়ি ঠিক করা থাকলেও গাড়ি আসতে আসতে প্রায় সকাল আটটা বেজে গেল। আহমেদনগর থেকে অজন্তার দূরত্ব কম করে ২১৫ কিমি। আর ইলোরার দূরত্ব কম করে ১৩৫ কিমি। ড্রাইভার বলল একদিনে দুটো স্পট ঠিক ঠাক কভার করা যাবেনা, তাই কেবল ইলোরা ও তার সঙ্গে আওরাঙ্গবাদের কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখা উচিত। কিন্তু আমিও নাছোড় বান্দা এতদূর এসে অজন্তা না দেখে ফিরব না। সেইমত ঠিক হল আগে অজন্তা যাওয়া হবে এবং ফেরার পথে ইলোরা ঢুকব। আমাদের গাড়ি NH-60 ধরে এগোতে থাকল। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। তাই দিনের বেলা আবহাওয়া খুবই শুষ্ক। রাস্তার দুইধারে দেখলাম সেলো পাম্পের মাধ্যমে আখের চাষ হচ্ছে। শুধুমাত্র এই আহমেদনগরেই উনিশটা চিনির কারখানা রয়েছে, এই নগর সমবায় আন্দোলনের জন্মস্থান হিসাবেও পরিচিত। আওরাঙ্গবাদের যানজট কাটিয়ে মাঝখানে দুপুরের ভোজন সেরে যখন অজন্তায় পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে ১২:১০ মিঃ।

পার্কিং এরিয়া থেকে বাস ধরবার জন্য স্ট্যান্ডে এলাম। এখান থেকে মূল গেটের দূরত্ব ৪ কিমি। এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম

ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (MTDC)-এর ব্যাটারিচালিত এসি ও নন এসি বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের লাইন অনুযায়ী একটি এসি বাসে জায়গা হল। বাস গিয়ে দাঁড়াল অজন্তা গুহাবলীর পাদদেশে।

অদূরের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কেটে এগোতে শুরু করলাম। এগোনোর পথেই বাঁদিকে দেখতে পেলাম এমটিডিসি-র একটি সুন্দর রেষ্টুরেন্ট। তার পাশেই ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্য বিরাট এক সাইন বোর্ডে অজন্তার গুহাগুলির নাম্বারসহ ম্যাপ দিয়ে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। এরই ফাঁকে রাস্তার পাশে টগর গাছের ডালে একটি টিকেলস ব্লুফ্লইক্যাচার বসে থাকতে দেখলাম। খুব কাছাকাছি থাকায় সুন্দর কয়েকটি ছবি পাওয়া গেল।

গিরিখাতের পাথর কেটে তিরিশটি গুহা নিয়ে অজন্তা গুহাবলী। গুহাগুলিকে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে হয়। এখানে দেখলাম পোর্টারের ব্যবস্থাও রয়েছে। বারোশো টাকার বিনিময়ে চারজন পোর্টার কাঁধে বয়ে ঘুরে দেখায়। আমরা ধীরে ধীরে চড়াই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলাম। এখান থেকে পুরো দৃশ্যটা সুন্দর দেখা যায়। এই গুহাগুলি মূলত বৌদ্ধধর্মের উপাসনা গৃহ ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব দুই থেকে সাত দশকের মাঝামাঝি এই গুহাগুলি তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। অজন্তার দেওয়ালের চিত্রগুলিতে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতায় আনা হয় অজন্তাকে। আমরা ১নং গুহার দিকে এগোতে লাগলাম। গুহা মন্দিরগুলিতে দুটি বা তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। একটি মূল প্রবেশদ্বার ও অন্যগুলো পার্শ্বদ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রত্যেক গুহার ভেতরে ঢুকতে গেলে প্রথমে জুতো খুলে ঢুকতে হয়। গুহার ভেতরে একসঙ্গে সাত-আট জনের বেশি ঢুকতে দেওয়া হয় না। গুহার বাইরে যতটা গরম ভেতরে ততটা ঠান্ডা।

গুহার ভেতরে ঢুকতেই সবার প্রথমে চোখে পড়ল সামনের দেওয়ালে বুদ্ধের একটি বিশাল মূর্তি। ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রায় এই মূর্তিটি শিল্পনৈপুণ্যে অনবদ্য। গুহার অন্যান্য দেওয়ালে রয়েছে জাতক কাহিনির ফ্রেস্কো। ওখান থেকে বেরিয়ে ২নং গুহায় প্রবেশ করলাম। ২নং গুহার প্রবেশদ্বার ১নং গুহার চেয়ে বেশি কারুকার্যমন্ডিত। গুহার ভেতরে ঢুকে দেখলাম চারিপাশে রয়েছে বড় চারটে স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভে সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। মেঝে ব্যতীত দেওয়াল ও ছাদের সর্বত্রই চিত্রিত। দেওয়াল জুড়ে বুদ্ধের জীবনকাহিনি ছাড়াও বিভিন্ন পশু, পাখির ছবি রয়েছে। এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ গুহা ঘুরে নেবার পর আমার শরীরটা একটু খারাপ করতে লাগল। পাহাড়ি রুক্ষ এলাকা হওয়ার কারণে এখানে এইসময়টা ভীষণ গরম। একটা ছায়াঢাকা জায়গা দেখে বসে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা পরের দর্শনের জন্য এগিয়ে গেল। অজন্তা উপভোগ করার জন্য একটা গোটা দিন ঘোরাও যথেষ্ট নয়।

এখান থেকে সোজা যাব ইলোরাতে, দূরত্ব ১০০ কিমি আর আওরাঙ্গবাদের থেকে দূরত্ব ৩০ কিমি। যখন ইলোরার গেটে পৌছালাম তখন ঘড়িতে চারটে বাজে। গুহাগুলি সন্ধে সোয়া ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই ইলোরাকে স্থানীয় লোকেরা ভেলুরা বা এলুরা বলে থাকে। ধারণা করা হয় প্রাচীন এলাপুরা নাম থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে মোট চৌত্রিশটি গুহা রয়েছে। যার মধ্যে সতেরটি হিন্দু ধর্মের, বারটি বৌদ্ধ ধর্মের ও পাঁচটি জৈন ধর্মের। এটি বর্তমানে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতায় আনা হয়েছে। ইলোরাতে যতগুলি গুহা রয়েছে তার মধ্যে ষোল নং গুহা কৈলাসনাথ মন্দির নামে খ্যাত, যেটি সব থেকে বিস্ময়কর ও ইলোরার প্রাণ কেন্দ্র।

টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে সরাসরি ষোল নং গুহাতে প্রবেশ করলাম। পুরো গুহাটি একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি হয়েছে। তিন দিকের পাথর কেটে খাদ তৈরি করে এই ৩০০ ফুট লম্বা, ১৫০ ফুট চাওড়া আর ১০০ ফুট উঁচু মন্দিরটি বার করা হয়। প্রত্যেক শিবমন্দিরের সামনে যেমন একটি ষাঁড় বিদ্যমান থাকে তেমনি এখানেও এই গুহার প্রবেশদ্বারের সামনে নন্দীর প্রতিকৃতি রয়েছে। মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই ডান দিকে রয়েছে পার্বতী ও বাম দিকে রয়েছে গণেশের মূর্তি। আর সামনেই চোখে পড়ল অনেকগুলো পদ্মের উপর অধিষ্ঠিত দেবী লক্ষ্মী। দ্বার থেকে বাম দিকের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই প্রথমেই চোখে পড়ল ১১৫ ফুট লম্বা বিস্ময়কর অলঙ্কৃত স্তম্ভ। যেটি সম্পূর্ণ একটি মাত্র পাথর খোদাই করে নির্মিত। এই কৈলাস মন্দিরের চারিপাশটাই বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি রয়েছে। মন্দিরটি পাঁচটা ভাগে বিন্যস্ত। যথা গোপুর, অর্ধমন্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন, গর্ভগৃহ ও শিখর। বিভিন্ন তলের মধ্যে যোগসূত্রের মাধ্যম হিসাবে সিঁড়ি রয়েছে। এই মন্দিরটিতে ১২০ ধরনের শিবের মূর্তি রয়েছে। পুরো মন্দিরটিকে একটি রথের আকৃতিতে খোদাই করা হয়েছে। মন্দিরের বাম দিকের দেওয়ালে খোদিত হয়েছে মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনি আর ডান দিকের দেওয়ালে খোদিত হয়েছে রামায়নের কিছু কাহিনি।

কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম মেরামতির কাজ চলছে, সেই জন্যে মন্দিরের সর্বত্র যাওয়া যাচ্ছে না। ডান দিকের সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এলাম। এখান থেকে মন্দিরের অনেকটা ভাগই চোখে পড়ছে। পড়ন্ত সূর্যের কিরণে কৈলাসনাথ মন্দিরটিকে আরো মায়াবী দেখালো। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই অপরূপ প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে দেখতে কখন যে ঘড়িতে ছটা বেজে গেছে বুঝতেই পারিনি। এবার ফেরার পালা। বাকী রয়ে গেল ইলোরা-অজন্তা দুইয়েরই আরও আরও সব গুহা, আওরঙ্গাবাদের গুহাবলী, অজেয় কেল্লা দৌলতাবাদ, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্র, তাজমহলের আদলে তৈরি বিবি কা মকবারা। এযাত্রায় তবু অজন্তা-ইলোরাকে বুড়িছোঁয়া তো হল - এটুকুই পাওয়া।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কম্পিউটার অপারেটার পলাশ পান্ডা-র সখ ফোটোগ্রাফি ও বেড়ানো।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com